আত্মকথা

১৫ই জুলাই
২০২১

পত্রিকার পক্ষ থেকে

প্রায় দেড় বছর ধরে মহামারীর সাথে ঘর করা হয়ে গেল আমাদের । তমসাচ্ছন্ন এই অন্ধকার এখুনি কেটে যাবে এমন কোন আশার আলো আমরা দেখতে পাইনি । দেশে বিদেশে প্রচুর মানুষ মারা গেছেন এবং সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে আমাদের আশেপাশেও। কিছুদিন আগে চলে গেলেন প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষ ও । মানব সভ্যতার এই সঙ্কটে যদি কেউ নিরলস লড়াই করে থাকে তাহলে সেটা হল বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞানের আলো দেখানো পথে অজস্র একদম রণাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মরণপণ লড়াই করে চলেছেন চিকিৎসক , নার্স এবং আরো অনেক অজস্র স্বাস্থ্যকর্মী । তাঁদের সবাইকে আত্মকথা'র পক্ষ থেকে রইলো কুর্নিশ । অনেক আশা জাগিয়ে এসেছে বেশ কিছু ভ্যাক্সিন এবং আরো কিছু ভ্যাকসিন আসতে চলেছে । আপাতত আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ কীভাবে সবাই এই ভ্যাকসিন পেতে পারেন এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আত্মকথার পক্ষ থেকে সমস্ত সদস্যদের বলব আপনারা নিজেরা ভ্যাকসিন নেবেন তো অবশ্যই সেই সাথে দেখুন আপনাদের আশেপাশে যারা অর্থনৈতিক ভাবে বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছেন তাঁদের এই ভ্যাকসিন নিতে সাহায্য করুন। কারণ মনে রাখতে হবে আমরা তখনই সুরক্ষিত যখন এই পৃথিবীর একজনও অরক্ষিত নন।

যেহেতু অতিমারীর প্রভাব আমরা এখনো সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেতে পারিনি। এখনো আমাদের মেনে চলতে হচ্ছে বেশ কিছু নিয়ম বিধি । এখনো আমরা সামনা সামনি দেখা সাক্ষাৎ , মুখোমুখি কথা বলতে পারছিনা। এই দুঃসময়ে কিছুটা হলেও সেই দুরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পেরেছে এই আত্মকথা। নয় নয় করে যার বয়স হল কুড়ি বছর। এবং এই মুহূর্তে হয়ত সত্যিই আরো ভালো হত যদি আমরা আরো একটু কাছাকাছি সময়ের ব্যবধানে আত্মকথা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু এই একটি বিষয় সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনাদের উপরে । আপনারা যদি চান তাহলে আমাদের কাছে এখন থেকেই পাঠাতে শুরু করুন লেখা , কবিতা , গল্প , ছবি … নীচের ই-মেল ঠিকানায়…

atmaja_calcutta@yahoo.com অথবা piyanaskar@gmail.com অথবা prasun2008@yahoo.co.in
খুব তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের আত্মকথার পরবর্তী সংখ্যা বের করব এই স্বপ্ন মনের মধ্যে নিয়ে আজ এই ১৫ই জুলাই , ২০২১ আমরা আত্মকথার এইবারের সংখ্যাটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম…

এই মুহূর্তে বর্ষাকে হৃদয়ে ধরে নিয়ে , চোখে আগামী শারদীয়ার উৎসবের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখে সবাই ভালো থাকুন , সুস্থ থাকুন … সবাইকে ভালোবাসুন , ভালো রাখুন ।

'আত্মকথা'র সম্পাদক মন্ডলী

মাটিতে শয়ান বুকের উপরে এসে
ঝরে পড়ে আছে কত বাসাহারা শিশু
অসাড় হাতের ডানায় অনিঃশেষে-
কোনোখানে দিশা দেখাতে পারিনি কিছু।
তবু একবার আমারই শিয়রদেশে
ভোলাও ব্যক্তি, ভুলিয়ে দাও-বা-দলও-
সেদিন যেভাবে বলতে সহজে এসে
সেই কথাগুলি আরো একবার বলো।

(শঙ্খ ঘোষ)

সম্পাদকের কলমে

আবারও ফিরে এলো কোভিদ-১৯ প্রসঙ্গ। প্রতিষেধক আবিষ্কার সত্ত্বেও আমরা কোভিদের দ্বিতীয় ঢেউকে আটকাতে পারিনি। তার সম্ভাব্য কারণ সমূহ পর্যালোচনা করার জন্য শামিল না হলেও, কিছু আলোচনা করা যেতেই পারে। একটা প্রধান কারণ অবশ্যই হল চিকিৎসকমহলের সতর্কতাবাণী সত্ত্বেও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা না করেই জনগণের লাগামছাড়া এবং সতর্কতাবিহীন দৈনিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া। প্রতিষেধক আবিষ্কারের আনন্দে টীকাকরণ ভালোভাবে শুরু হবার আগেই মানুষ প্রাক্-কোভিদ অভ্যাসে ফিরে গেল, যদিও এ ব্যাপারে ডাক্তারবাবুদের থেকে অনেক সাবধানবাণী ছিল। এছাড়া নোভেল করোনা ভাইরাসের জিনগত পরিবর্তন অনেকাংশে দায়ী। তবে নির্বাচন নিয়ে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে যেভাবে মানুষের সমাবেশ ঘটেছে এবং তার সঙ্গে টীকাকরণের ধীরগতি কোভিদের দ্বিতীয় ঢেউকে খাল-কেটে-কুমীর-আনার মত যেন নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল। যাই হোক্, দ্বিতীয় ঢেউ প্রায় অতিক্রান্ত। কোভিদের তৃতীয় ঢেউ আসন্ন। আশা করি আমরা দ্বিতীয় ঢেউয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি যে এবার আমাদের অনেক্ বেশি সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তৃতীয় ঢেউকে আমরা সহজে অতিক্রম করতে পারি; বেশি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাতে তা না যেতে পারে। দ্রুতগতিতে টীকাকরণ আমাদের, পুরোটা না হলেও, কিছুটা রক্ষাকবচ দেবে বলে আশা করা যায়। অবশ্যই সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ভুয়ো টীকাকরণ যাতে আবার না ঘটে সেদিকে সরকারের নজর দেওয়া দরকার। কিছু বিজ্ঞানী একটু আশার আলো দিয়েছেন এই বলে যে তৃতীয় ঢেউয়ের পরবর্তী ঢেউগুলি আর তত সংক্রামক বা মারাত্মক হবে না।

কোভিদের আবহে অনেক অনেক খারাপ খবরের মধ্যে একটা হল যে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ঘেঁটে গেল। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষা হচ্ছে না। এতে খুশীর কারণ থাকতে পারে বটে, কিন্তু তার পরিণতি হয়তো সবসময় সুখের নাও হতে পারে। মুড়ি-মুড়কী এক হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা তো আছেই। তাছাড়া এটা একটা ছাপ যেটা সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। তবে খুব হতাশ হবারও কোনও কারণ নেই। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে একজন যোগ্য মানুষ কোথাও না কোথাও উপযুক্ত সন্মান পাবে।

আত্মজা এবং তার ক্রিয়াকর্ম এই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের মধ্যেও নিজ লয়ে এগিয়ে চলেছে। এই বছরে আত্মকথার এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি সময়মত ১৫ই জুলাই প্রকাশিত হবে। গত সংখ্যা ১৫ই জানুয়ারী প্রকাশের পর আমাদের রবীন্দ্র -নজরুল সন্ধ্যা অনলাইনে উদ্‌যাপিত হয়েছে গত ৬ই জুন। তারপর বার্ষিক সাধারণ সভাও অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৭শে জুন। সেদিন সভার পর একটি শ্রুতিনাটক সবাইকে মুগ্ধ করেছে। অন-লাইন ব্যবস্থায় আত্মজার কার্য্যনির্বাহী কমিটির দু'টো মিটিং হয়েছে ১৪ই মার্চ এবং ২৩শে মে। আমরা এখনও আশা রাখি যে এই বছরের শেষে ছোটখাটো হলেও একটা অনুষ্ঠান, হয়তো বা অনলাইনে, করতে পারব আমাদের কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে।

এখন জোর কদমে রাত জেগে ফুটবল খেলা দেখা চলছে। এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন সেই সময়টা শেষ হয়ে যাবে। ইউরো এবং কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন কারা কারা হল তা আমরা জেনে যাব। নতুন আরেকটা আকর্ষণীয় কিছুনা আসা অবধি(এবং তারপরেও) সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ ও নিরাপদে থাকুন এবং আনন্দে থাকুন। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

অনুপ দেওয়ানজী
সম্পাদক, আত্মজা

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে তুলি , পাত্রে নিয়ে রঙ ...

শিল্পী—শুচিস্মিতা শিকদার

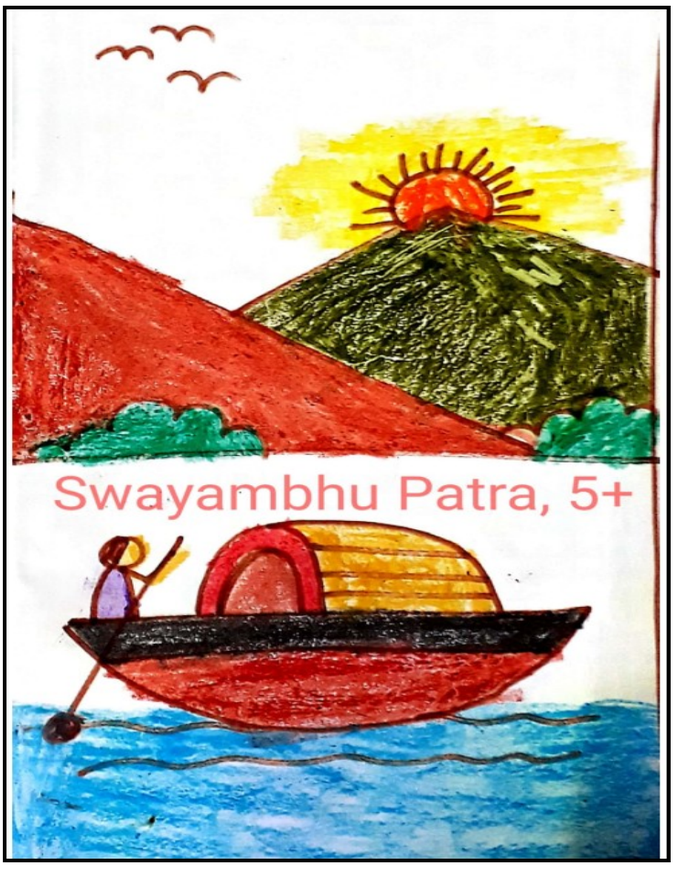

শিল্পী—স্বয়ম্ভু পাত্র

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে তুলি , পাত্রে নিয়ে রঙ ...

শিল্পী—শুভলক্ষ্মী ঘোষ

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে তুলি , পাত্রে নিয়ে রঙ ...

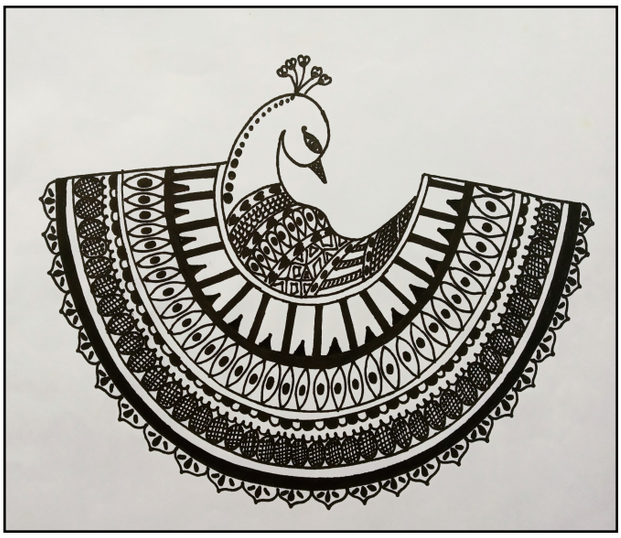

শিল্পী—অহিতি

Kalpana Datta-The firebrand Bengali Freedom Fighter

Kaushik Bhattacharya

Kalpana Datta was an Indian Freedom fighter and a member of the armed independence movement led by the Great Masterda Surya Sen, which carried out the Chittagong armory raid in 1930.

She was born in a small village of Chittagong District in the Bengal Province of British India (now Bangladesh) on 27 July 1913. Her father Binod Behari Datta was a government employee. After completing matriculation in 1929, she went to Calcutta to join Bethune College for graduation in Science. There she joined the Chhatri Sangha, a semi-revolutionary organization.

The Chittagong Armory Raid took place on 18 April 1930 and Kalpana joined the "Indian Republican Army, Chittagong branch", the armed resistance group led by Surya Sen in May 1931. She was entrusted with the safe carrying of heavy explosive materials from Calcutta. She also secretly prepared ‘gun-cotton’ and planned to plant a dynamite fuse under the court building and inside the jail to free the revolutionary leaders, who were being tried in a special tribunal. In September, 1931 Surya Sen entrusted her along with Pritilata Waddedar to attack the European Club in Chittagong. But a week before the attack, she was arrested. She went underground after her release on bail. On 16 February 1933 the police encircled their hiding place in Gairala village, and in that raid Surya Sen was arrested but Kalpana was able to escape from there. She was finally arrested on 19 May 1933 and imprisoned. She was released in 1939. After that she graduated from the Calcutta University in 1940. She served as a relief worker during the 1943 Bengal famine and during the partition of Bengal. Later, she joined the Indian Statistical Institute where she worked until her retirement. She died in Calcutta on 8 February 1995. Kalpana Datta still remains an inspiration to all Bengalis and Indians for her courageous act during Indian freedom movement.

আরেকটিবার স্বয়ংসিদ্ধা
ফিরে এসো মাগো , দুধভাত মাখা বাটিতে
আমার শিকড় আশ্রয় চায়
এখনো তোমার হাজারফসলি মাটিতে। (মল্লিকা সেনগুপ্ত)

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে কলম , শব্দে , অক্ষরে ...

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার :স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য মহীয়সী রমণী

ঋতায়ন চট্টোপাধ্যায়

২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে আমরা তিনজন এবং আরও বন্ধুবান্ধব (প্রায় ৩৫ জনের একটি দল) মিলে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রথমে কুষ্টিয়া ওখান থেকে কুমিল্লা তারপর চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম যাব শুনে আমার গায়ে কেমন যেন শিহরন জাগছিল। সেই চট্টগ্রাম যেখানে ১৯৩০ সালের ১৮ইএপ্রিল শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে শুনলাম যে পরের দিনই ইউরোপিয়ান ক্লাব এবং দামপাড়া পুলিশ স্টেশন দেখতে যাওয়া হবে। শুনে তো উত্তেজনায় আমার রাতে ঘুমই আসেনা যে কখন সকাল হবে। শেষমেশ সকাল হলো। সকাল দশটায় সবাই মিলে সেই ব্রিটিশ আমলের পুলিশ স্টেশন এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।কিন্তু সেটি যে আসলে কোথায় তা কেউ বলতে পারলোনা। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খোঁজার পর জানতে পারলাম সেই ব্রিটিশ আমলের থানা আর কোথাও নেই, আছে আমাদের সামনেই।ভাবলাম এতক্ষণ ধরে চোখে পড়লনা?

তবে চোখে না পড়ারই কথা কারণ সেটি আর থানা নেই, হয়েছে একটি সংশোধনাগার । শেষপর্যন্ত ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেলনা। খুব দুঃখ হলো, যাকগে ইউরোপিয়ান ক্লাব তো দেখা যাবে তাই মনের মধ্যে আবার নতুন করে উত্তেজনা জেগে উঠলো । বেলা দুটো নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে। জায়গাটা দেখেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠলো। ক্লাবটির বেশিরভাগ অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে "ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি"-র বোমাবর্ষণে, তবে যেটুকু আছে তাতে একটি সরকারি অফিস খুলেছে, এবং সামনের দিকটায় আছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মৃতি জাদুঘর। সেদিনটি শুক্রবার ছিল বলে সেটি বন্ধ ছিল।

কিছুক্ষণ ওখানে থাকার পর আমরা গেলাম সেই স্থানে যেখানে প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে শহীদ হয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম সেখানে একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কিছুক্ষণ ওখানে থাকতেই চোখে জল চলে এলো। আমরা ওনার মূর্তিতে মালা দিলাম এবং দেশাত্মবোধক গান করলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে আমার ওনার আত্মোৎসর্গের কাহিনী মনে পড়ে গেল। সেটাই আমি এখানে লিখছি এবার।১৯১১ সালের ৫ই মে অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম জেলার ধলঘাট গ্রামে প্রীতিলতা জন্মগ্রহণ করেন। ওনার ডাকনাম ছিল রানী এবং ছদ্মনাম ফুলতারা। 'ডঃখাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়' ছিল তার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯২৬ সালে তিনি সংস্কৃত পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি কয়েকটি বিষয় লেটার মার্কস পেয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৩০ সালে আই.এ পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সবার মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। এই ফলাফলের জন্য তিনি মাসিক ২০টাকার বৃত্তি পান এবং তারপর কলকাতার 'বেথুনকলেজে' পড়তে যান। সেখানে ১৯৩২ সালে ডিস্টিংশন নিয়ে তিনি বি.এ. পাস করেন।

এইসময় তিনি বাঘাযতীন, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল দত্তের জীবনী পড়ে বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং ঢাকায় ফিরে গিয়ে দিপালী সংঘের সাথে যোগ দিয়ে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা প্রভৃতি শিখেছিলেন। মাস্টারদার নেতৃত্বে এক সশস্ত্র বিপ্লব সমগ্র চট্টগ্রামকে ইংরেজ শাসন মুক্ত করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ অফিস দখল করে। এইসময় প্রীতিলতা বিপ্লবী কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপটেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব মাস্টারদা প্রীতিলতাকে দেন। কয়েকজন বিপ্লবীকে নিয়ে প্রীতিলতা ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ক্লাবরক্ষীদের পাল্টা আক্রমণে তিনি আহত হন। আহত প্রীতিলতা অন্যান্য বিপ্লবীদের স্থানত্যাগের নির্দেশ দেন এবং পুলিশের হাতে ধরা না দেবার জন্য তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে তার নাম চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলাম বাস ছাড়ার সময় চলে এসেছে। কিন্তু এই স্মৃতি আমার জীবনে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

Dīn-i IlāhīAkbar

Iman Ghosh ,Class VIII, St. Claret School, Barrackpore

Born: October 1542 in Umarkot, now in Pakistan

Died: October 1605 in Agra, India

Reign: 1556 to 1605

Full name: Abu'l-Fath Jalal-ud-din Muhammad Akbar

We all have heard about Mughal emperor Akbar. All of us have some idea about why he is called *the greatest of the greater Mughals.*He had some qualities which the other Mughal Emperors did not have.There is a legend about Akbar's birth. Akbar was born at a time, when his father Humayun was running away towards north-west frontier regionas he was chased by Sher Shah. At that time, a son was born to him. Mughals used to celebrate the birth of a baby through distribution of gifts to their people. Humayun being in exile, had nothing much with him, except for a piece of kasturi (deer musk). Humayun divided it into smaller pieces and distributed them amongst his people and courtesans and prayed, 'Let the name of my little son Akbar be spread over the whole world like the fragrance of kasturi'. His prayers was fulfilled.

After getting back his empire, Humayun could rule it for a very short period of time. After his death, Akbar became the emperor at an early age of thirteen. Bairam Khan, the guardian of Akbar, acted on his behalf to administer the defense and administration till Akbar turned eighteen. Before that, Akbar spent his time in sports as well as in hunting. Meanwhile, in 1556, Bairam Khan had to fight a number of wars to crush all the potential threats to Akbar's throne. This includes a fierce battle against a very powerful Afghan army led by Himu. Thereafter, in 1560 Akbar became the supreme authority, when the power and control was transferred from Bairam Khan to him.

Akbar ruled for almost 50 years.A strong personality and a successful leader, Akbar gradually extended the Mughal empire to include much of the Indian subcontinent. He built a

powerful military system and initiated effective political and socialreforms. During his reign, the capitals Delhi and Agra, were recaptured from Afghans;entire empire was partitioned into administrative provinces for smooth running, revenue system was reformed, large road network was built and maintained for smooth communication.

Akbar gave equal importance to people of all religions. Dīn-i Ilāhī was an ethical system founded by him. There were no sacred scriptures or a priestly hierarchy in this system.The soul was encouraged to purify itself through yearning for God, celibacy was condoned, and the slaughter of animals was forbidden.

Akbar was passionate about music, art and literature. He created a library of over 24,000 volumes written in Arabic, Greek, Latin, Kashmiri, Persian, Sanskrit and Urdu. He did much of the cataloging himself through three main groupings.There were nine very talented persons in his court who were called together the Navaratna, the NineGems.Birbal and Tansen were the most well-known among them. Birbal was his advisor and Tansen was the court musician. Foundations for a multicultural empire under Mughal rule were laid during his reign.

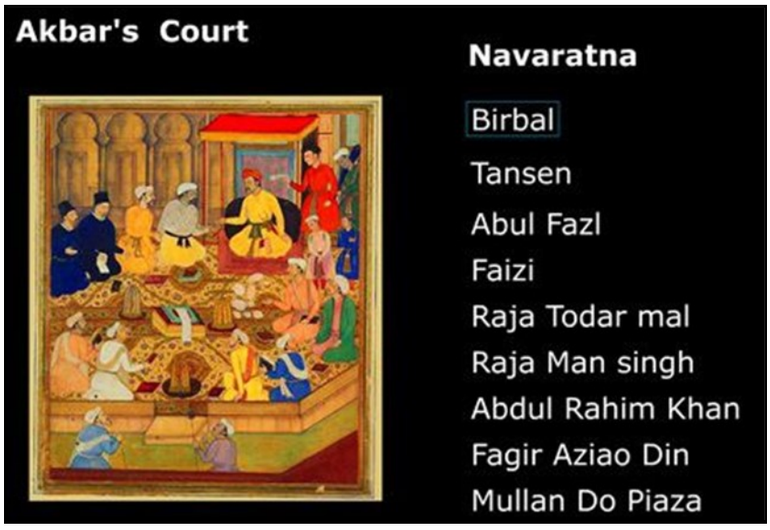

The Navratna in Akbars Court

"People's identities as Indians, as Asians, or as members of the human race, seemed to give way - quite suddenly - to sectarian identification with Hindu, Muslim, or Sikh communities."

CRIME AND MENTAL WELL BEING

Ahana Basu

Crime and mental well-being are co-related. Crime forces a person to become mentally unhealthy and mental illness forces a person to commit a crime. In this perspective, many rules and policies are designed to motivate a person by taking him to a rehabilitation center.

Now what is crime? According to the Indian penal code crime is defined as a “wrongdoing in society”. The next questions come that are whether and to what extent community-level factors affect mental health of public? Constant rumors or de- motivation is the main reason for a person going into depression, ultimately leads to commit suicide. People will keep demotivate but we have to remain strong and fight for ourselves.

One of the trending examples I want to give that school students fight to achieve high marks in examinations. The word “competition”is rooted in there head. But trust me there is no way to do it. If I want to score 90 % I should target only for that, leaving what others are doing there. I should focus on my aims and goals what makes me happy not others. The way our generation is flowing it which will soon lead to an uneven or imbalance in society.

After fighting in school and returning home a child fights again with parents is also another cause for crime. We the Indians regard our parents as God .Nowadays college going students are also in depression. So from where it is coming from? Serve depression to lead to a crime. Having a fight with one person and affecting it into others is a also a crime. Now a person who does the crime is one type. The person who sees it have another level of trauma and the person who listen to it get affected in other manner. Crime can also occur to take revenge, from depression and poverty. So we have to find it out why crime is increasing. Laws are there to give punishment to the occurrence.

Crime is basically defined through the eyes of society. An act is not a crime until society doomed it to be and if society considers some act not opposed to their group sentiments than that act is not a crime at all. Crime is an act which offends and threatens the society, and thus such acts need to be punished. The basic reasons behind the making of law are to penalize those who commit a crime and these laws are the result of society’s need to stop happening of such acts. We nowadays without sharing problem to our near and dear one we share it with social media (Facebook, whats app) with views of comment and opinions which also leads a crime sometime. So we have to change some habit from our nowadays lifestyle ….

And here a self-realization that I can suggest that to motivate yourself. No doctor, no medicine can cure you until you motivate yourself. So keep patience and try to motivate yourself.Yes it will take time, but if you think you will do it or you have to do it then only you can do it.No other can do it for you. So my suggestion to my juniors is that“don’t run in a race, do what you like, enjoy your childhood and play. Every phase of a human life have a different meaning and motive. So enjoy that too”.

কাদম্বিনীর কথা

ঈশিতা দে

উনিশ শতকের শেষ দিকের কলকাতা। সকালবেলার রাস্তায় ব্যস্তভাবে ছুটে চলেছে এক ঘোড়ার গাড়ি। দরজা বন্ধ, জানলা অর্ধেক খোলা, ভেতরে আবছা আলো, গাড়িতে কারা বসে তা বোঝা যাচ্ছে না, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় কোনও আপিস-বাবু চলেছেন। আসলে গাড়ির ভিতরে বসে দুই বাঙালি মহিলা! একজন সুন্দরী, গৌরবর্ণা, লম্বায়-চওড়ায় মানানসই চেহারা। আর একজন অপেক্ষাকৃত ছোট-খাট চেহারার। দুজনেরই পরিপাটি বেশবাস। প্রথমজনের হাতে কুরুশ বোনার কাঠি আর সুতো, হাত চলছে দ্রুত গতিতে, ফুটে উঠছে লতাপাতার সুচারু নকশা। দ্বিতীয়জনের কোলে কাঠের মাঝারি আকারের বাক্স, তিনি মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে দেখছেন গাড়ি কোন রাস্তায় চলেছে।

অবশেষে গাড়ি এসে পৌঁছল একটা বড় বাড়ির ফটকের সামনে, দারোয়ান ফটক খুলে দিল, গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল একটা গাড়ি বারান্দার নিচে। বাড়ির কর্তা সামনের ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন, গাড়ি থামতেই হাতজোড় করে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। গাড়ি থেকে নেমে সামান্য কুশল বিনিময় করেই দুই মহিলা তাড়াতাড়ি ভিতরে চললেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আরও দু-তিনজন মহিলা। ভিতরের একটি ঘর থেকে ভেসে আসছে একটি অল্পবয়সী মেয়ের কাতরানি, প্রসব-বেদনায় ছটপট করছে মেয়েটি। সবাই মিলে ঐ ঘরের দিকেই চলেছেন। আগন্তুক মহিলারা বাড়ির দু-একজন মহিলাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। কর্তাবাবু উদ্বিগ্ন মুখে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একমিনিট, দু-মিনিট করে সময় কাটতে লাগল, প্রায় একঘণ্টা বাদে সুন্দরী মহিলা আর তাঁর ছোটখাট চেহারার সহকারিণী বেরিয়ে এলেন— ভালভাবে প্রসব হয়েছে, প্রসূতি ও শিশু দুজনেই সুস্থ আছে, মুখে তাই পরিতৃপ্তির হাসি। কর্তার মুখেও হাসি ধরে না। ভোর-রাত থেকে প্রসব-বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিল তাঁর মেয়েটি, সকাল হতেই দাই-দের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তারা এসে দেখেশুনে বলেছিল, এ বড় কঠিন কেস, মা বা শিশু বা দুজনেই মারা যেতে পারে। তখন গাড়ি পাঠিয়ে এই দুই মহিলাকে আনা হয়েছে। মা এবং শিশু দুজনেই সুস্থ আছে শুনে কর্তা এঁদের কিভাবে ধন্যবাদ দেবেন, কিভাবে আপ্যায়ন করবেন ভেবে পান না! দাসীকে ডেকে ধমক দেন— "এঁদের জলখাবারের ব্যবস্থা হয়েছে? গিন্নিমা কোথায়?" দাসী বলে— "গিন্নিমা রান্নাঘরে— জলখাবার হয়ে এল, এখন এনারা তৈরি হলেই হয়।" এই বলে সে দুজনকে কলঘর দেখিয়ে দেয়। অল্পসময়ের মধ্যেই দুজন তৈরি হয়ে আসেন। ভিতরের বারান্দায় দুটি আসন পাতা, সামনে কলাপাতা। দুজনে বসতেই রান্নার ঠাকুর পরিবেশন করে লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম, মিষ্টি। ভাল রান্না, দুজনে তৃপ্তি করে খেলেন, কর্তা পুরো সময়টা সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খাওয়া শেষ করে, সম্মানদক্ষিণাটি ব্যাগে পুরে দুজনে বাড়ির পথ ধরলেন। গল্পটা এই ভাবে শেষ হলেই ভাল হত, কিন্তু ঠিক সেইরকমটি হয়নি। খাওয়া শেষ না হতেই দাসী এসে বলল— "গিন্নিমা বলে পাঠালেন দাইরা যেন পাতা তুলে এঁটো পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, ঝিরা ওসব করতে পারবে না" .....

.....

লম্বাচওড়া সুন্দরী মহিলাটি হলেন ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় আর সঙ্গের মহিলাটি হলেন তাঁর সহকারিণী নগেনদিদি। আজ পয়লা জুলাই, ২০২১ সাল, চিকিৎসক দিবস। সেই উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এই একুশ শতকের তৃতীয় দশক— এই একশো কুড়ি বছরে কি আমরা কি এক হাজার বছর পেরিয়ে আসিনি?

সুন্দরী কাদম্বিনীর মুকুটে অনেক পালক। ১৮ই জুলাই ১৯৬১ সালে বিহারের ভাগলপুরে তাঁর জন্ম। ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এনট্রান্স পাস করেন, তার আগে আর কোন মেয়ে ঐ পরীক্ষাতে পাস করেননি। বলতে গেলে তাঁর জন্যই বেথুন কলেজ প্রথমে এফ-এ কোর্স, পরে বি-এ কোর্স চালু করে। তারপর ১৮৮৩ সালে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। তাঁরা দুজন সারা দেশের (কেউ কেউ বলেন সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও) প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। হাজার বাধা পেরিয়ে ১৮৮৩ সালেই কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। ১৮৮৬ সালে GBMC পাস করে হলেন দেশের প্রথম প্র্যাকটিসিং মহিলা ডাক্তার। এই বিষয়ে বম্বের আনন্দীবাই জোশীর নাম করা যায়। তিনি আমেরিকা থেকে ডাক্তারি পাস করেন ১৮৮৬ সালে আর ঐ বছরের শেষের দিকে দেশে ফিরে প্র্যাকটিস শুরু করেন। কিন্তু পরের বছরই ১৮৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র বাইশ বছর বয়সে আনন্দীবাই যক্ষ্মারোগে মারা যান। তাই তাঁর চিকিৎসক জীবন তিন-চার মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি।

কাদম্বিনীর সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। এমন কি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলও কাদম্বিনীর বিষয়ে জানতে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৮৮ সালে লেখা নাইটিংগেলের একটি চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৩ সালে কাদম্বিনী ইংল্যান্ড গেলেন, ভর্তি হলেন এডিনবরা মহিলা মেডিকেল কলেজে। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনটি ডিপ্লোমা পেলেন — LRCP (এডিনবরা), LRCS (গ্লাসগো), GFPS (ডাবলিন)। ১৮৯৫ সালে দেশে ফিরে তিনি প্রথমেই গেলেন নেপালে— রাজমাতার চিকিৎসা করতে। রাজমাতাকে সারিয়ে অনেক সম্মান অর্জন করে কাদম্বিনী ফিরলেন কলকাতায়। তারপর আক্ষরিক অর্থেই জীবনের শেষ দিনটি (৩ অকটোবর, ১৯২৩) পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা করেছেন।

সারাজীবন কাদম্বিনী প্রচুর কাজ করেছেন— সংসার এবং ডাক্তারি পেশা সামলে তাঁকে রাজনীতির মঞ্চেও দেখা গেছে। ১৮৮৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে তিনি ছিলেন ছয়জন মহিলা প্রতিনিধির অন্যতমা। বাংলা বিভাজনের পরে ১৯০৬ সালে যে মহিলা অধিবেশন হয় তিনি ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা।

বিহারের ভাগলপুর থেকে একটি মেয়ে এসে এত কাণ্ড করল, সেজন্য অবশ্য তাঁর সহযোগী পুরুষদেরও কৃতিত্ব অনেকটা। কাদম্বিনীর বাবা ছিলেন ব্রাহ্ম নেতা ব্রজকিশোর বসু। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার লোক হলেও তিনি হেডমাস্টারি করতেন ভাগলপুরে। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল দেখার মত। আবার কাদম্বিনীর স্বামী ছিলেন ডাকসাইটে ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রধানত স্বামীর উৎসাহেই কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। দ্বারকানাথ তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষার আলোতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিতেন, আবার সমাজের নানা নিন্দে-মন্দের আঘাত থেকে হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। স্ত্রীর সম্মানরক্ষার জন্য তিনি কতটা সক্রিয় ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিয়ে এই লেখা শেষ করি।

কলকাতার একটি পত্রিকায় একবার কাদম্বিনীকে ব্যঙ্গ করে একটি লেখা বেরোয়। পত্রিকা থেকে লেখাটি কেটে নিয়ে পকেটে পুরে স্বামী চললেন সম্পাদকের দপ্তরে। হাতে তখনকার দিনের প্রথামত একটি লাঠি। দপ্তরে পৌঁছে ভাঁজ করা কাগজটি সম্পাদকের হাতে দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন— "এই লেখা তোমার?" সম্পাদকমশাই অবাক— "হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?" দ্বারকানাথ কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে গুলি পাকিয়ে সম্পাদকের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, বললেন— "হয়েছে এই যে আমি হলাম দ্বারিক গাঙ্গুলি আর আমার স্ত্রীর নাম ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। Now I will make you eat your own words. কাগজের এই গুলি এখনই গিলে নাও, নয়তো কি হবে বুঝতেই পারছ!" বলে হাতের মোটা লাঠিটা মেঝের উপর ঠুকতে লাগলেন। বলিষ্ঠ চেহারার দ্বারকানাথের ঐ মূর্তি দেখে সম্পাদকের গলা তো শুকিয়ে কাঠ। টেবিলের উপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চোঁ করে জলটা গিলে নিলেন, সঙ্গে ঐ কাগজের গুলিটাও। দ্বারকানাথ বললেন—"এই সম্পাদকীয় প্রত্যাহার করে কালই যেন বিজ্ঞপ্তি বেরোয়, দেরি যেন না হয়! নয়তো আমি আবার আসব!" বলে হাতের লাঠিটা ফের ঠুকতে লাগলেন মেঝের উপর। বলা বাহুল্য, সম্পাদকীয় প্রত্যাহার করে বিজ্ঞপ্তি বেরোতে কোন দেরি হয়নি!

তথ্যসূত্রঃ

১। পাকদণ্ডী, লীলা মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স
২। প্রথম আলো, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স
৩। https://en.wikipedia.org/wiki/Kadambini_Ganguly
৪। https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/kadambini-ganguli

অন্যান্যবারের মত এবারেও আমাদের পত্রিকা সম্পাদক প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের কাছ থেকে লেখার আহ্বান করেছিলেন । এই সংখ্যার বিষয় ছিল — ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী! আমাদের দুই আত্মজ কৌশিক ভট্টাচার্য এবং ঋতায়ন চট্টোপাধ্যায় এবং সেই সঙ্গে ঈশিতা দে'র কাছ থেকে লেখা পেলাম আমরা। এছাড়াও আমরা লেখা পেয়েছি আত্মজা অহনা বসু এবং আত্মজ ইমন ঘোষের কাছ থেকেও। আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে সবার জন্যেই রইলো উষ্ণ ভালোবাসা .....

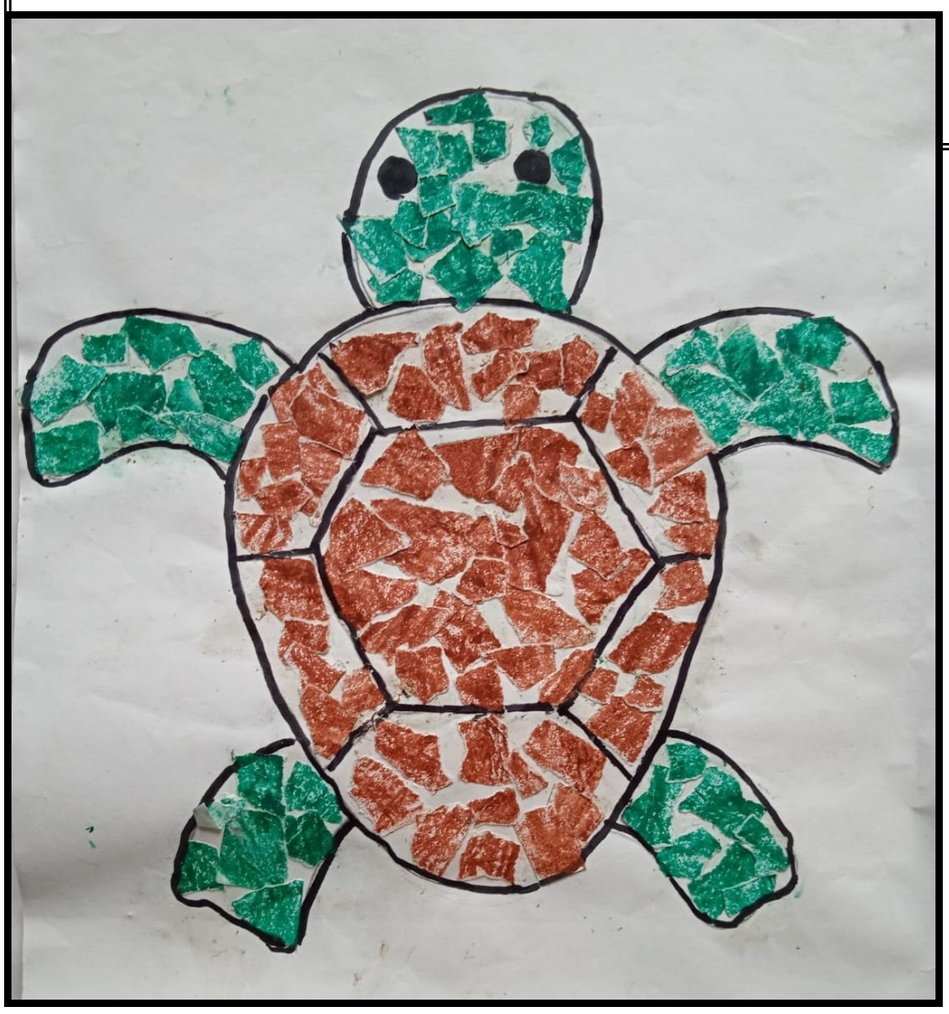

এই ছবিটি আমাদের জন্যে উপহার দিয়েছেন শিল্পী—তৌশিনি দাস
বয়স—৩ বছর

নিয়মিত বিভাগ — শ্রী প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

পাখিদের কথা: ৩য় পর্ব

বসন্ত বউরি(Coppersmith Barbet)

এই পাখিটাকে আমরা হয়তো অনেকেই চিনি। এক পাখি, হরেক নাম। এক এক জায়গায় এর এক এক নাম। গাঁয়ের লোকের যা ইচ্ছে হয় মনে, তা দিয়েই এই পাখিটার নামকরণ করে। তবে একে বসন্ত বউরি নামে অনেকেই সহজে চিনতে পারে। এটা একটা ছোট্ট পাখি, বলতে গেলে অনেকটা চড়ুইয়ের মত। গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়, একঘেয়ে টুক্ টুক্ করে ডেকে ডেকে জানান দেয় তার উপস্থিতির কথা। বসন্ত বউরি গাছের সবুজ পাতার আড়ালে বসে ডাকতে থাকে, তার দেখা পাওয়ার জো নেই।

এক ঝলক দেখলে মনে হয় যেন সবুজে রঙের একটা ছোট্ট পাখি। মাথা আর বুকটা টক্‌টকে লাল, লাল বুকের পর থেকে শরীরের নীচের দিকে হলদে পালকের উপর সবুজ ছিট্ ছিট্। ঠোঁট খুব মোটা এবং ভারীও বটে। ঠোঁটের রঙ আবার কালো। পায়ের রঙ লালচে, চোখের তারা খয়েরী। লেজটা তার ছোট, অনেকটা ঢোকানো; দ্রুত ছুটে বাড়ায় ডানা ঝাপটে। চোখের নিমেষে কোথায় যেন চলে যায়, হয়তো বা অন্য কোন গাছের ডালে।

বসন্ত বউরিকে সাধারণতঃ দেখা যায় বসন্তের শুরুতে, গরমকালের শেষ অবধি। গাঁয়ে-শহরে এই পাখি টুক্-টুক্‌রো করে ডাকতে থাকে। অনেকেরই কানে আসে সেই ডাক। এই ছোট্ট পাখিদের জীবনটা কেটে যায় গাছের ডালে ডালে আর পাতায় পাতায়। পোকামাকড় ধরার মত ওড়ার কায়দা তার জানা নেই। সোজা ভাবে তারা উড়তে পারে, কখনো নীচু ডালে নেমে বসে না। বিশেষতঃ উঁচু গাছের সবুজ পাতার আড়ালে বসে স্যাক্‌রার হাতুড়ী ঠোকার মত ঠক্ ঠক্ শব্দ করে বলে অনেকে একে স্যাক্‌রা পাখিও বলে থাকে।

এরা শীতের শুরু থেকে বর্ষারম্ভ পর্যন্ত গাছের ডালে গর্ত করে বাসা বানায়। দু'জনে মিলে একসাথে কাজ করে এই বাসা বানাতে। সংসারের যাবতীয় কাজ দু'জনে মিলে ভাগাভাগি করে সম্পন্ন করে। বসন্ত বউরির প্রিয় খাবার তালিকায় থাকে বট-অশ্বত্থ-পাকুড় গাছের ফল, আর উড়ন্ত পোকামাকড়।

বসন্ত বউরি(Coppersmith Barbet)

ছবি— ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

তৃপ্তি

শর্মিলা মজুমদার

অনিকেত অফিস থেকে ফিরে কলিংবেল বাজিয়েই শুনতে পেল বাড়ির ভেতর থেকে রুনার চাপা কান্নার আওয়াজ। ওর মনে পড়ে যায় কিছু বছর আগের কথা, যখন অনিকেত ও রুনা দু'জনের কেউই মানসিকভাবে সুখী ছিল না। বিবাহিত জীবনের আটবছর পরেও ওদের সন্তান ছিল না। ওরা দুইজন একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। ওই কঠিন সময়ে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে লড়াই করার মানসিক জোর বজায় রেখেছিল ওদের ভালোবাসা এবং বিশ্বাস। অনিকেতের মা এসে দরজা খোলেন। মায়ের মুখে অসন্তোষের প্রকাশ দেখেই অনিকেতের বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ, বিগত দুই বছর ধরে এই অশান্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ, যখন তৃপ্তি প্রথম এই বাড়িতে এসেছিল, তখন কিন্তু এই রকম অমানবিক পরিস্থিতির অবতারনা হয় নি।

অনিকেত ও রুনার দীর্ঘ ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে কখনো পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয় নি। না, আট বছর সন্তানহীন থাকার পরেও না। রুনা শ্বশুর বাড়িতে আদরিনী হয়েই থেকেছে। অনিকেতের বাবা-মা পুরোন মানসিকতার হলেও ওঁদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে রুনার কোনও অসুবিধা হয় নি। অনিকেতও দায়িত্বশীল মানুষ। বাবা -মা, স্ত্রী ও সংসারের প্রতি যত্নবান। বাবা-মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ওদের নিয়ে গিয়েছে বিভিন্ন ডাক্তারের দরজায়। সেই কিছু বছরে ওরা অনেক রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে। যেখানে শুনেছে ভালো ডাক্তারের কথা – ছুটে গিয়েছে। কিছুদিন চিকিৎসার পর বিফল হয়ে একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছে। আবার দুইজনে কোথাও ঘুরতে গিয়েছে – কয়েক দিনের জন্য মনকে ভুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে। দীর্ঘদিন বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গিয়ে একটা কথা বুঝেছে যে চিকিৎসক কিন্তু প্রথমেই বুঝে যান কাদের চিকিৎসা সফল হবে, আর কাদের হবে না। কিন্তু তাঁরা আমাদের জানান না। মানুষের দূর্বল মনের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চলে চিকিৎসার নামে ব্যবসা। এইভাবেই চলছিল আশা-নিরাশার দোলায়। কিন্তু রুনা এইভাবে আর মানসিক কষ্ট নিতে পারছিল না। দিনে-দিনে ও চুপ হয়ে যায়। ক্রমশঃ নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে নিজের মধ্যে। মনোস্তরের এক অজানা জগতের দিকে পা বাড়ায়। 'মা' ডাক শোনার আকুলতা শান্ত রুনাকে অস্থির করে তোলে। ওর এই পরিবর্তন ওর আপনজনদের বুঝতে একটু সময় লেগে যায়। বিষয়টি প্রথম বুঝতে পারেন রুনার শাশুড়ি। সারাদিন একসাথের থাকার জন্য তাঁর কাছে অস্বাভাবিক লাগে রুনার আচরণ। রুনা এতটাই আন্‌মনা হয়ে থাকে যে প্রায় কোন কথাই যেন সে শুনতে পায় না। যন্ত্রচালিত মানুষের মত সংসারের গতানুগতিক কাজগুলি করে যায়। তিনি লক্ষ্য করেন, মাঝেমধ্যেই সে আপন মনে বিড়বিড় করে কিছু বলে চলে। অনিকেতকে তিনি সব জানান। অনিকেতের কাছেও কিছুদিন ধরে রুনার ব্যবহার অস্বাভাবিক লাগছিল। মা-ছেলে আলোচনা করে একদিন রুনার সঙ্গে কথা বলে। রুনা শুধুই উদ্‌ভ্রান্তের মতো শূন্য দৃষ্টি নিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে; তার দুই চোখ দিয়ে অবিরাম জলের ধারা। পরিবারের সকলেই খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন রুনাকে নিয়ে। এই রকম এক সময়ে রুনার বাবা-মা অনিকেতের বাড়িতে আসেন এবং ওকে মনো-চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। অবিলম্বেই সে রুনাকে নিয়ে মনোবিদের কাছে যায়। মনোবিদের কাছে তিন থেকে চারবার যাওয়ার পর রুনার মনোজগতের জট খুলতে থাকে। একদিন মনোবিদ অনিকেতকে জানান যে মাতৃত্বের অভাববোধ থেকেই রুনার এই মনোকষ্টের সূত্রপাত। তিনি একটি শিশুকে দত্তক নেওয়ার পরামর্শ দেন। অনিকেত নিজের বাবা-মা এবং রুনার বাবা-মাকে ডেকে ও রুনাকে সাথে নিয়ে মনোবিদের পরামর্শ সকলকে জানায়। রুনার বাবা-মা জানিয়ে দেন যে তাদের কোন আপত্তি নেই এবং, সবাইকে অবাক করে দিয়ে, অনিকেতের পুরোন মানসিকতার বাবা-মাও কিন্তু উদারতা দেখান। মা হওয়ার আনন্দে রুনা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

জীবন ওদের জন্য এই নতুন অভিজ্ঞতার ডালি সাজিয়ে রেখেছিল। পাঁচটি দত্তক কেন্দ্রের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করে। সেখানে গিয়েও দেখে কতো দম্পতি দীর্ঘ অপেক্ষায় রয়েছেন সন্তানসুখ লাভের জন্য। একটি দত্তক কেন্দ্রের আধিকারিকের সঙ্গে ওদের কথা চূড়ান্ত হয়। প্রথমেই ওরা ঠিক করে নেয় যে মেয়ে সন্তান দত্তক নেবে। রুনা আনন্দে আত্মহারা; মেয়েকে সে দেখেওনি, কিন্তু তারজন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সংগ্রহ করতে শুরু করে দেয়। এরপরে এলো সেই বহু প্রতিক্ষিত দিন। অনিকেত-রুনা প্রথম তাদের সন্তানকে দেখল। মাত্র দেড়মাসের এক দেবশিশু। দুইজনেরই চোখে জল এসে যায়। রুনা মেয়েকে কোলে নিয়ে আধিকারিককে অনুরোধ করে যে সে তার মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়; আইনি কাজ চলুক তার পথে। কিন্তু তা যে হবার নয়; বাস্তব বড়কঠিন। এরপর দ্বিতীয় দিন যেদিন দত্তক কেন্দ্রে যায় মেয়েকে বাড়ি আনার জন্য, সেদিন বাকি শিশুদের জন্য উপহার ও খাদ্যসামগ্রী ওরা দু'হাত ভরে নিয়ে যায়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে রুনার বুক হাহাকার করে ওঠে। এতো শিশু অনাথ! কতো দম্পতি সন্তান পাওয়ার জন্য বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সেখানে এতো শিশুবাবা-মা-হারা, পরিবারহীন হয়ে রয়েছে! ওর মনেহয়, আর্থিক সামর্থ থাকলে সে আরো কিছু শিশুর 'মা' হয়ে উঠতে পারতো। বড় অসহায় মনেহয় নিজেকে। অনিকেত কথা দেয় মেয়ে একটু বড় হলে ওরা আরো একটি সন্তানকে দত্তক নেবে। মেয়েকে নিয়ে গর্বিত বাবা-মা বাড়ি আসে। অনিকেতের মা শঙ্খ বাজিয়ে নাতনিকে অভ্যর্থনা করেন। রুনা মেয়ের নাম দেয় তৃপ্তি। বাড়িতে আনন্দ উৎসব হয়; আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী প্রায় একমাস ধরে উপহার নিয়ে এসে তৃপ্তিকে দেখে যান। রুনা-অনিকেতের কিন্তু কোন দিকে মন নেই। মেয়েই ওদের জগৎ; ওদের জীবনটাই বদলে দিয়েছে ওই একরত্তি ফুটফুটে শিশুটি। ঠানদা-ঠানদি, দাদু-দিদার আদরে-নজরে তৃপ্তি বেড়ে উঠতে লাগলো। অনিকেত-রুনা ভালো স্কুলে ওকে ভর্তি করিয়েছে। খেলা-পড়াশোনা, বেড়াতে যাওয়া, সব মিলিয়ে তৃপ্তি খুবই ভালো আছে এবং তৃপ্তি আসার পর বাড়ির সবাইও ভালো আছেন; রুনারও আর কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু রুনা আবার কাঁদছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে সুখে থাকা বোধহয় রুনার ভাগ্যে নেই। গত দুই বছর ধরে রুনা আবার মানসিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। অনিকেতও এই জায়গায় বড় অসহায় হয়ে পড়েছে। তৃপ্তির যখন বছর আটেক বয়স তখন একদিন আকস্মিকভাবেই রুনা বুঝতে পারে প্রাকৃতিক নিয়মেই সে 'মা' হতে চলেছে। আনন্দে রুনা আত্মহারা হয়ে যায়। অনিকেতকে জানায়। দুইজনে ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিশ্চিত হয়। এইটাই তো চেয়েছিল এতোবছর ধরে। আজ অযাচিতভাবে সেই উপহার ওরা পেতে চলেছে। মনে মনে ওরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে বাড়িতে এসে ওরা সুখবরটা সবাইকে জানায়। অনিকেতের বাবা খুবই আনন্দিত হন; কিন্তু সমস্যা আসে ওর মায়ের দিক থেকে। আনন্দিত তিনিও হয়েছেন; তবে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব দেন। বলেন, 'নিজেদের সন্তান যখন আসছেই, তখন যেখান থেকে মেয়েকে এনেছিলে সেখানে ওকে রেখে এসো'। ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হয়। কয়েক মুহূর্ত কারো মুখ থেকে শব্দ সরে না। নীরবতা ভেঙ্গে অনিকেতের বাবাই প্রথম বলেন, 'এ কি কথা তুমি বললে? এতো নিষ্ঠুর তুমি কি করে হলে?' অনিকেত বলে, 'মা, তৃপ্তি আমাদের মেয়ে, তোমাদের নাতনি। ওকে ছাড়া আমরা বাঁচবো না'। কিন্তু ওঁর সেই এক কথা। রুনা এতোটাই বিস্মিত যে ওর মুখ থেকে কথা সরে না। বেশ কিছুদিন এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে থাকে। রুনা বোঝে না যে সে একটি সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে বলে তৃপ্তি কেন শাস্তি পাবে। এই সম্ভাব্য জন্মের জন্য তো তৃপ্তি দায়ী নয়। একটি অসহায় শিশুকে কিভাবে আবার পরিবার থেকে বঞ্চিত করা যায়? আর তাছাড়া তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তো সেই মিটিয়েছে। রুনা আর অনিকেতের ছায়া হল তৃপ্তি, ওদের অস্তিত্ব হল তৃপ্তি। রুনার শাশুড়ি এবার তাকে বলে, 'কার না কার মেয়েকে আর ঘরে রাখার প্রয়োজন নেই, যখন তুমি নিজেই মা হতে চলেছো'। রুনা শান্ত মাথায় শাশুড়িকে অনেক বোঝায়। তখনকার মত তিনি চুপ করে গেলেও কিন্তু নিজের মতামতেই স্থির থাকেন। বাড়ির কারোর কথাই তিনি মানছেননা। এমনকি তৃপ্তির প্রতি ব্যবহারেও পার্থক্য দেখা যায়। সমস্যা আরও বাড়ে রুনা একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার পর। রুনার এত সুখের দিনেও চোখের জল বাঁধ মানেনা। তৃপ্তি ওর ছোটভাইকে খুব ভালোবাসে; সব সময় নজরে রাখে। কিন্তু অনিকেতের মা দেখতে পেলেই ওকে তাঁর নাতির কাছ থেকে সরিয়ে দেয়, ছুঁতে দেয়না। একদিন অনিকেতের চোখে পড়ে বিষয়টি। প্রবল প্রতিবাদ করে ওঠে সে। অনিকেতের বাবাও ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু সকলের আড়ালে তিনি নিজের মতই থাকেন। ঠাম্মির আদর থেকে বঞ্চিত তৃপ্তিও দুঃখ পায়; কাঁদে ওর মায়ের কাছে।

ওদের ছেলের এখন বছর খানেক বয়স। আজও অনিকেত বাড়ি ফিরে দেখে একই পরিস্থিতি, একই পরিবেশ বাড়ির। তৃপ্তিও এখন কিছু কিছু বুঝতে পারে। সেটাই সবথেকে ভয়ঙ্কর ওদের কাছে এবং অবশ্যই তৃপ্তির কাছে। অবাঞ্ছিত কিছু প্রশ্ন ওর শিশু মনে উঁকি দেয়। একদিন ঠান্দাকে জিজ্ঞেস্ করে, 'ঠাম্মি, কেন তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না? তুমি আমাকে ভালোবাসো তো, ঠান্দা?' বাবা-মাকে প্রশ্ন করে, 'আমি কে গো? ঠাম্মি আমাকে কোথায় রেখে আসতে বলে? এটা আমার বাড়ি না?' রুনা দুই হাত দিয়ে মেয়েকে বুকে আঁকড়ে ধরে অঝোরে কাঁদে। অনিকেত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে বোঝায়। কিছুতেই এই পরিস্থিতি ঠিক হবার নয় বুঝে অনিকেতের বাবা ওদের পরামর্শ দেন, 'তোমরা আলাদা থাকো। তৃপ্তির ভবিষ্যতের জন্যই তোমাদের আলাদা থাকতে হবে। এখানে থাকলে ওদের ভাই-বোনের সম্পর্কও নষ্ট হবে'। অনিকেত বলে, 'কিন্তু তোমাদের বয়স হয়েছে। কে দেখবে তোমাদের?' রুনাও অনিকেতের কথায় সায় দেয়। তবে এটাও বোঝে যে শ্বশুরমশায় ঠিক কথাই বলেছেন। অনিকেত ওর মাকে এই সিদ্ধান্ত জানানোর পরেও ওঁরদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একমাত্র ছেলে তাঁকে ছেড়ে যাবে না। তাই তিনি নিজের মানসিকতা বদলানোরও প্রয়োজন মনে করেননি। এইরকম অসহনীয় অবস্থায় অনিকেতের বাবা একদিন সবাইকে ডেকে জানান যে তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রমে তাঁদের দুইজনের জন্য বুকিং করে এসেছেন। অনিকেতকে বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি যে তোমার পক্ষে আমাদের ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই আমি সবদিক ভেবে এই ব্যবস্থা নিয়েছি। ওখানে আমাদের অযত্ন হবে না। দেখাশোনার লোকও আছে। তুমি তোমার সাধ্যমত বৃদ্ধাশ্রমে টাকা পাঠিও'। অনিকেত বলে, 'কিন্তু বাবা, আত্মীয়-সমাজ তো বুঝবে না। তারা তো নিন্দা করবে'। বাবা বলেন, 'সবার আগে তোমার পরিবার। আর সমাজ তো আমাদের নিয়েই তৈরী হয়। যে সমাজে তোমার মায়ের মত মানসিকতার মানুষ আছেন, তাদের কথা না শুনলেও চলবে। তোমার মা যখন নিজেকে শোধরাতে পারলেন না, তখন তার জন্য এই শাস্তি ও এই ব্যবস্থাই শ্রেয়। আরেকটা কথা, কোনদিনও তৃপ্তিকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে না'।

রুনার শাশুড়ির চোখে জল। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই; দেরি হয়ে গেছে। এতদিন কারোর কোন কথাই তিনি শোনেননি, নিজের জেদে স্থির থেকেছেন। নির্দিষ্ট দিনে ওঁরা দুইজন বৃদ্ধাশ্রমের দিকে রওনা দেন। অনিকেত সঙ্গে যায়। রুনা দুই সন্তান নিয়ে বাড়িতে। রুনাও কাঁদছে; এইরকম পরিণতি তো সে চায় নি। দিন যায়, মাস যায়; অনিকেত বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে, ওঁদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। রুনাও মাঝে মধ্যে যায় ছেলেকে নিয়ে। বাদ পড়ে যায় তৃপ্তি। কয়েক মাস তার ঠাম্মিকে না দেখতে পেয়ে শিশুমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বায়না ধরে ঠান্দা-ঠাম্মির কাছে যাবে। কিন্তু অনিকেত জানে তার বাবার নির্দেশের কথা। তবে মেয়ের বায়নার কাছে পরাস্ত হয় বাবার নির্দেশ। এর ছুটির দিনের সকালে ওরা চারজনেই উপস্থিত হয় বৃদ্ধাশ্রমে বাবা-মায়ের কাছে। ঠাম্মি নাত্নিকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে চলেন। তৃপ্তি ঠাম্মির চোখ মুছিয়ে বলে, 'কেঁদো না, ঠাম্মি। এই তো আমি এসে গেছি তোমার কাছে'। তৃপ্তির সরল ভালোবাসায় ভেঙ্গে যায় সব বাঁধা। এরপর থেকে অনিকেত প্রায়ই সপরিবারে বাবা-মায়ের কাছে যায়। আবার অনিকেতের বাবা-মাও পূজোর ছুটি বা অন্যান্য ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে একসঙ্গে সময় কাটান। রুনার চোখে আর জল নেই; রুনা আর কাঁদে না। তৃপ্তির সংসার এইভাবেই এগিয়ে চলে সামনের জীবনের দিকে।

"A rosy hue settles all around
You've got the feel you're on solid ground
For a spell or two, no-one seems forlorn
This comes to pass when a child is born

And all of this happens because the world is waiting,
Waiting for one child
Black, white, yellow, no-one knows
But a child that will grow up and turn tears to laughter,
Hate to love, war to peace and everyone to everyone's neighbour
And misery and suffering will be words to be forgotten, forever

It's all a dream, an illusion now
It must come true, sometime soon somehow
All across the land, dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born" (Fred Jay)

Happy memories we make with our family is not important... It's everything

Sheemantika Nag

I have been asked by my dear friends to share the experience of adopting my child, though not a child anymore but a vibrant young lady, whose growing up has taken us through a journey of joy and heartaches.

Sharing our experience of going through the process of adoption has been a family affair as we all cherish the memory of those times. Our daughter grew up listening to the story of her becoming a part of this family; so to get a proper picture of that experience, we all put in our experiences together. This could not have been possible with my singular effort.

We had decided to adopt rather suddenly, as just prior to that, we had spent couple of months with my sister's family, who had adopted a son and a daughter. In fact, we were highly influenced with the thought of adoption after spending that time with the family and observing very closely the way they were growing as a family with love and affection.

It wasn't a very easy decision, though we had some second hand experience. We did consult our close friends and relatives who had adopted. Probably the first question that arises in everyone's mind before adopting is how difficult is it to develop the bondage. Then of course there were several other mundane queries. All the feedback and their experiences seemed very good and encouraging. Then came the question of genes; yes, we all think a lot about the heredity factors without knowing anything. Today, I can very confidently say that genes surely has been responsible for the color of her hair and eyes as well as to a certain extent complexion, the rest of course is what she got from us over the years. Looking back, these queries and hesitations seem meaningless.

In the 90s, adoption laws were very different and totally dependent on the agencies. We decided that Missionaries of Charity was a renowned agency and got ourselves enrolled. Our first interview wasn't a pleasant one as we felt that the Sister-in-charge was a bit discouraging. My husband was rather upset with this situation but I was determined to go ahead and of course he was ready to give in with a little persuasion, as he too was keen on having a baby girl. Needless to say, the encouragement we got from our parents played a major role.

One might think that the Sister was heartless, being so discouraging , but come to think of it, one needs a lot of mental preparation before undertaking the responsibility of a child and may be the Sister was testing our eagerness for adoption. In the meantime, during these pre-adoptive sessions, there were several meetings with the social worker, and our families. Finally, there was the home study. A social worker visited our house to meet the family, friends and neighbors. I still remember the day and the excitement of my mother-in law. Thanks to her, we had a house full of people who were all very positive and encouraging about adoption. The home study thus was a cake walk, but very helpful.

We continued with our visits to the agency when finally Sister Bernie, who was in-charge, told us that they did have a girl child for us, but she was very tiny and underweight. Taking a decision was difficult and so we consulted an experienced doctor. He said that this was not a big deal as the children at these homes were usually underweight due to lack of individual care and love and this could be taken care of when she came home. So, we were ready to see our daughter.

I still remember that day as if it was yesterday. Off we went to visit our daughter, along with my mother. We reached the Home a little ahead of time. I was very excited and determined to love the little one, whoever was destined for us. Sister Bernie came in, a baby in her lap. My mother and I were already in the room waiting eagerly to see her but my husband was very nervous and skeptical and decided not to enter the room. So here comes the baby wearing a bright red frock, very tiny, with hardly any hair, two large ears and eyes with a killing smile on her face. It was love at first sight for me and my mother. In the mean time, my husband couldn't control his excitement and peeped through a tiny hole on the door of the room and the moment he saw the smile on the baby's face, he barged in and that tiny little angel looked at him and gave another toothless mind blowing smile and my husband immediately took her in his lap and as it was destined, we became parents!!!

Now, came the hardest part, "WAITING". She had to go through health check up, then the results of some pathological tests as advised by the doctor. It took about 7 to 10 days, and each day seemed like a month. Thank God the results were good and we finally got the permission to bring our daughter home. The very next day our family, with full of excitement went to bring our princess home.

Many years have gone by, some good days speckled with some not so good ones. Bringing up a child is no doubt hard, but it is never boring, rather I would say it is a challenge we enjoyed taking up.

[Pradip Nag , my husband and I had adopted Ahana our daughter in 1997. I came across an artcle about Atmaja in 2002. The concept of adoptive parents association interested me and I got in touch with Nilanjana Gupta one of the founding members, to begin our long journey with Atmaja.]

"এই একটি বিষয়
যা আসবে এবং দাবি করবে
"সত্যকে" --
এই একটি বিষয়
যা আসবে এবং আদেশ করবে
"সৌন্দর্য" --"
('এটি' , মূল কবিতা - মায়াকোভস্কি , ভাষান্তর - মুকুল গুহ)

Lucy is the name of our childhood dream

“This world at best could belong to some unnamed Hariyal or even a Shankhachil that has crossed over all the borders of this world.”

Swapan Naskar

To Bengalis, the name Lucy, will always be associated with Rabindranath Thakur as in the fag end of the 19th century, a certain Dr. Scott played host to the poet and one of his two daughters, Lucy fell in love with Rabindranath. She not only fell in love with the poet but practically proposed to him. But still this name Lucy has not been able to create much a of an impression in our minds. So, even today while discussing 'love in the poet's life' we remember a lot of other names, but not Lucy.

The word 'Lucy' or light reverberated in our hearts with an unknown thrill for the first time when in 1967, John Lennon of Beatles published his composition, 'Lucy in the sky of diamonds' in the famous album, Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band. This thrill got further accentuated when the myth that this song was banned by BBC because of its association with the psychedelic drug LSD, got spread amongst the public. Officially, this famous broadcasting company never announced the so-called ban of Lucy. In fact they had banned another song and probably that's why this myth associating an infamous drug and a famous song got credence. Although Lennon had clarified that he had written the song remembering a picture of the classmate of his 3 year old son Julian had drawn, probably this was enough to send shivers of thrill in the hearts of domesticated Bengalis.

Let's leave this second Lucy as well and go a bit forward in time. November 1974. Anthropologist Donald Johanson and his assistant were working to unearth some fossils in the Hadar region of Ethiopia's Awas valley. One day while walking back to their car after the day's work, they chose to follow a dry water channel and there, they discovered a fossilized forearm of a humanoid. Johanson immediately realized that this was a piece of the forearm of a primitive woman whose biological name is Australopithecus apharensis under the class Hominid. Hominids represent a branch of the evolutionary tree that traces the path of the development of Homo sapiens from the apes. They are considered to be direct ancestors of us, Homo sapiens. Within a short while he found a portion of her skull, then the thigh bone and the pelvic bones. In a few hours, they found more than hundred pieces of this primitive woman's bones and could reconstruct an almost complete skeleton of her. (Pic 1). That night the explorers celebrated this find (later recognized as an epoch making discovery) and the song that was playing in that party was none other than, Beatle's ' Lucy in the sky with diamonds'. A member of the team of scientists, Pamela Alderman named the hominid skeleton, Lucy. Later Johanson wrote his book, 'Lucy- the beginnings of humankind'. Are you thinking that in my advanced age, I'm spinning a nostalgic tale on the charming name Lucy? Let's jump forward a few more decades.

In 2013, the scientists of NASA were searching for a suitable name for the spacecraft to be used in their Jupiter exploration project. Usually the names that are chosen for such expeditions, are meaningful to the objective of the project or are acronyms derived from several words. In this expedition, the spacecraft aimed to run a parallel course with the Trojans that go around Jupiter following the same orbit as the giant planet. Trojans are asteroids that formed at the same moment when our solar system was born. Because of the gravitational pull, these asteroids either coalesce to form a planet or crash down on the surface of some other planet. Some of them just keep hurtling through space until they burn out. Some asteroids cluster together and keep orbiting a planet in a manner not unlike our own moon.

Some others even manage to find their permanent address. Let's try to understand this in a bit of greater details.

In the solar system the planets, their satellites and the countless asteroids are all rotating with the Sun at the center; so they have a center of rotation. But the center of the sun and this center of rotation do not converge at the same point. Larger the planet further is it's center of rotation from the center of the sun. So in the case of Jupiter this distance is quite a lot. If we draw a line between the Sun and the Jupiter, there will be two points in it. These are called the Lagrange points. One of the points is near the Jupiter and towards the Sun. And the other is also near the Jupiter but far away from the Sun. At these two points the gravitational pull becomes zero as the gravity of Sun and Jupiter cancel each other out. The Trojans have got clustered at these two Lagrange points and they continue to rotate along with Jupiter right from the day they came into existence (Image-2). These are fossils remaining from the time of the birth of the planets and they hold some vital clues on the mystery of how the planets came into being. Scientists think that these Trojans exert some influence on our seas and the climate of the earth. They also conjecture that the Trojans might yield some hitherto unknown clues that may help unravel the birth-mystery of our planet Earth.

The possibility of these Trojans being a vital Missing-link led the chief of this special mission to the Jupiter, Harold Levison, to name it after Lucy, the primordial-woman fossil discovered in 1974. Not only that, Levison thinks that another connection of the Jupiter mission with the song, 'Lucy in the sky with diamonds' is, how the Trojans look in the space, like a luminous patch of sky studded with diamonds. From 2013 Lucy is getting ready for her dream flight. When would that magic moment arrive? The wait is almost over; she will soar towards her destination in October 2021. Her preparations are almost complete (Artist's impression of Lucy, the spaceship- image 3). She has miles to go before sleep and a lot to accomplish. Her first job will lay the foundations of a dream project. Let's learn more about it.

Starting in 2021, Lucy will fly for 12 years, till 2033. She will reach her first destination in 2025. Thereafter she will visit eight different asteroids. Amongst them she will meet one main asteroid belt and seven Trojans, in other words, the asteroids that remained between the two Lagrange points of Jupiter. Four of these asteroids are the members of the 'two-for-the-price-of-one' binary system.

In her complex trajectory Lucy will acquaint us with the two Trojan clusters on either side of Jupiter and send us photos of the three main types of Trojans, C,P and D. Out of these three types, type P and D are similar and are found in the icy masses of the Cooper belt (extended till beyond the orbit of Neptune). The C type Trojans are found outside the main asteroid belt, in the space between Mars and Jupiter (to get an idea about the position of these asteroids relative to the different planets, see image-4). The building materials of these three types of Trojans date from the time of the birth of the planets.

So, astrophysicists hope to get new insights into the birth mystery of the earth and the other planets by studying them. That makes the mission of Lucy not only different from other space missions but of special historical significance. This is the first time a spaceship, our yellow dream-bird will fly near the orbits of so many different planets in a single mission. And she will tell us stories, hitherto untold!

Lucy is really that yellow Phoenix of our childhood, perched on a branch of the Jamrul tree - the bird that gazes at the expanse of the universe with eyes full of wonder and dreams - dreams of a magnificent flight. The flight that soars and reaches the moon one day and then the Mars and then the Jupiter... and in the celestial clusters it searches on for an eternal story...In the poet's words... "Thy first primordial energy- illuminating the heavens in a dazzling radiance…

Dear reader let us also leave this faded ruins of 2020, let us spring free from the deepest of maladies and march forward towards 2021 where like the mythical Phoenix, our Lucy is getting bedecked for the flight of her dreams.

Pic -1

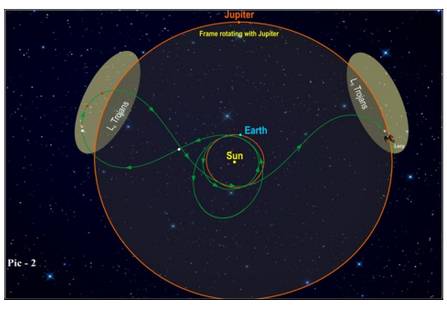

Pic - 2

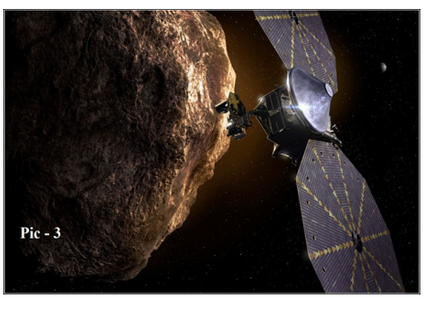
Pic - 3

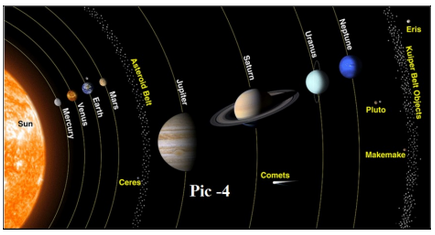

Pic -4

To know more on this mission please click -> https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index

আমি আমারই মত । অন্য কারো মত নই।

(পরিবার হল অতীতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র – ভবিষ্যতের সেতুঃআলেক্স হেলি)

বিকাশ প্রকাশ যোশী

(বিকাশ প্রকাশ যোশী পুনে নিবাসী এক সুপরিচিত লেখক। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স , মুম্বাই এবং এশিয়ান কলেজ অফ জারনালিজম , চেন্নাই থেকে তিনি তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র এবং এন জি ও তে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। গুজরাট থেকে উড়িষ্যা , পাঞ্জাব থেকে কর্ণাটক ... ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার গল্প লিখেছেন তিনি বিভিন্ন সময়ে। জ্ঞান হবার পর থেকেই বিভিন্ন গল্প শোনা এবং শোনানো তাঁর একটি বিশেষ প্রিয় কাজ এবং তাঁর ভালোবাসা। লেখা , জনসমগ্রে বক্তব্য রাখা , ভ্রমন , রান্না এবং বিভিন্ন ভাষা শেখার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ। তাঁর মতে আমাদের প্রত্যেকের এবং সবকিছুরই একটা নিজস্ব গল্প আছে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল কতটা সঠিক ভাবে এবং সততার সঙ্গে আমরা সেই গল্প শোনার চেষ্টা করি এবং বাকি পৃথিবীকে সেই গল্প বলি।)

ইংরেজি adoption বা বাংলায় দত্তক শব্দটির অভিধান গত অর্থ হল অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান হিসাবে সম্পূর্ণ আইনী মর্যাদার সঙ্গে প্রতিপালন করা বা প্রতিপালিত হওয়া। আপাত সংক্ষিপ্ত এই সংজ্ঞার আড়ালে কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর অর্থবহ দ্যোতনা।

যেদিন আমি প্রথম "দত্তক" শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম বা তার সম্পর্কে কিছু ধারণা করেছিলাম সেই দিনটির কথা আজও আমার মনে পড়ে। সেটা ছিল আমার উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের এক অনুষ্ঠানের দিন। স্কুল ছুটির পর এক আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের স্কুলে আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের উপর নানান অনুষ্ঠান করতাম। সেই মাসে আমাদের বিষয় ছিল মিশর, আর তাই আমাদের নানান কার্যকলাপ এর ভিত্তি ও ছিল মিশর। নির্ধারিত দিনে ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার ক্লাসে আমরা সবাই বিভিন্ন মিশরীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে স্কুলে এলাম , বাড়ি থেকে বিভিন্ন মিশরীয় খাবার বানিয়ে এনেছিলাম আর মিশর নিয়ে ছোট প্রতিবেদন পেশ করেছিলাম। আমাদের এক সহপাঠিনী অসাধারণ ক্লিওপেট্রা সেজে আর তার বাড়ি থেকে আনা সুস্বাদু মিশরীয় খাবারের জন্য সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। পরে আমরা যখন সব গুছিয়ে তুলছি তখন সেই সহপাঠিনীকে নিয়ে দুজন শিক্ষকের কথোপকথন আমার কানে এলো -

একজন তার সেদিনের উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করলেন আর সেই সঙ্গে তার পড়াশুনায় কৃতিত্বের কথাও বললেন। সেই সঙ্গে প্রশ্নচিহ্ন রেখে তাঁর আলগোছে বলা মন্তব্য " ও কিন্তু দত্তক সন্তান, তুমি জান?" কানে এলো আমার। অন্য শিক্ষিকার মুখে ছিল সম্মতি সূচক হাসি আর আমার সামনে এর বেশী কিছু না বলার স্পষ্ট ইঙ্গিত। আমার শিশু মন সেদিন "দত্তক" শব্দের অর্থ না বুঝতে পারলেও শব্দটির মধ্যে একটু যেন গোপন কিছু আলোচনার আভাস পেয়েছিল। আমার আত্মীয় স্বজন ,বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে দত্তক সন্তান কেউ ছিলেননা তাই আমার সেই শিশু মনের বিস্ময় অনেকদিন পর্যন্ত মনের মধ্যে গেঁথে ছিল।

ছেলেবেলার সেই স্বপ্ন আমার

জীবনে অনেকটা পথ চলার পর শেষপর্যন্ত একদিন আমি আমার ছোটবেলার স্বপ্ন আমার প্রথম বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার এই চিরকালের স্বপ্ন জীবনের চলার পথের বাঁকে নানান কাজের ভিড়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ২০১৭ সালে আমি নিজের কাছে নিজেই অঙ্গীকার বদ্ধ হই যে এবার আমাকে আমার স্বপ্নপূরণ করতেই হবে। আমার আজকের এই লেখা সেই স্বপ্নের বই যার নাম হয়তো রাখবো " আমার নাম সিন্যামন " তারই এক সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি। আশা করছি আগামী বছরই এটি প্রকাশিত হবে।

খুব সংক্ষেপে আর কিছুটা হয়তো আত্মপ্রচারের মতই নিজের বইয়ের প্রসঙ্গে বলিঃ পুনের ব্যস্ত সড়ক থেকে কলোল্লিনী , মন মুগ্ধ করা এবং একই সঙ্গে অগোছালো এই কলকাতা, কিংবা নন্দুরবারের পাহাড়ী নির্মল সবুজ উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো " আমার নাম সিন্যামন " কথা বলে নানান বাস্তব চরিত্রের মুখ দিয়ে। জীবনের অগণিত ভাললাগার মুহূর্তের এক চলমান , সংবেদনশীল গল্পকথা এই বই। ভারতবর্ষের শিশু ও কিশোর সাহিত্যের এমন কিছু বিষয়ের অন্বেষন এই প্রয়াস যেটা সম্ভবত কিছুটা ব্যতিক্রমীও।

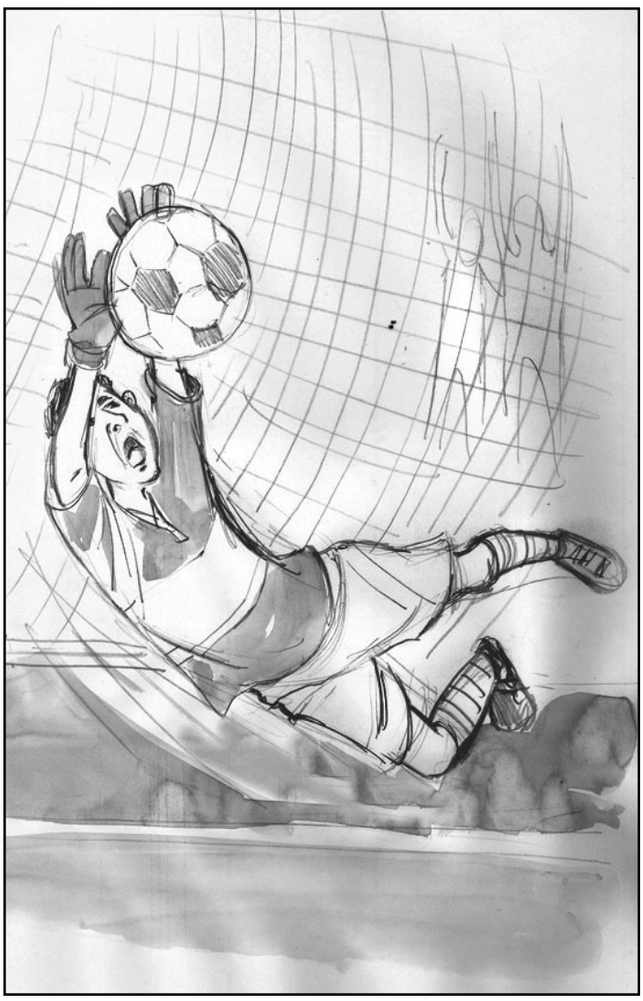

ছবি সৌজন্য—লেখক শ্রী বিকাশ প্রকাশ

মূল বিষয়

আমার এই বইটির অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয় হল দত্তক। তাই আত্মকথার জন্য আমার এই বইটির কিছুটা হয়ত প্রাককথন হিসাবে এই লেখা লিখতে বসে আমি ভীষণ ভাবে আনন্দিত। আমি আত্মজা'র সমস্ত সদস্য ও বিশেষ করে ডঃঅনুপ দেওয়ানজীকে আমাকে এই সুযোগ দেবার জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এখানে একটা প্রশ্ন এসেই পড়ে ,দত্তককে কেন আমি আমার বইয়ের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করলাম? আর কেনই বা এই বিষয়কে গল্পের বুননে গাঁথতে চাইছি? এই বিষয়ে আমার উত্তর হল লেখক তো গল্প নির্বাচন করেনা বরং গল্পই তার লেখককে খুঁজে নেয়। আর একবার যখন বিষয় খুঁজে নেয় লেখককে তখন লেখকের আর বিশেষ কিছু করার থাকেনা শুধু সেই বিষয়টিকে শব্দে অক্ষরে সাজিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরা ছাড়া।

তাই আমিও এরপরে দত্তক সম্পর্কে জানতে শুরু করি বিশেষত ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে। আমার যাত্রার শুরু হয় দত্তক বিষয়ক ভারতবর্ষের জটিল এবং পরিবর্তনশীল ধারণা নিয়ে। আমি সিদ্ধান্ত নিই এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মানুষ তাদের নিজের কথা নিজের মত করে বলুক , পাথর তার নিজের গতিতেই গড়িয়ে চলুক। আমার কোন পূর্ব নির্মিত নেতিবাচক ধারণা যেন কাহিনীর গতিরুদ্ধ না করে।

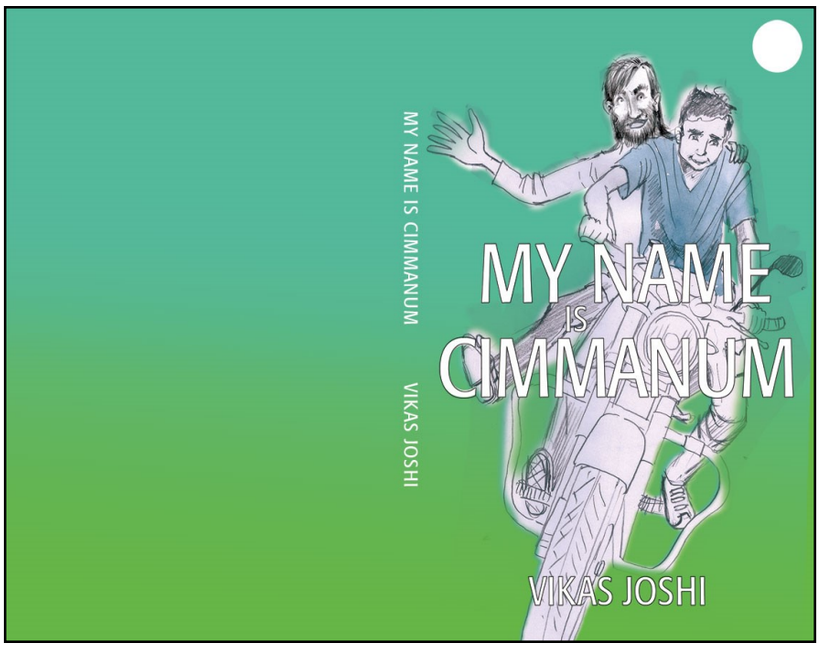

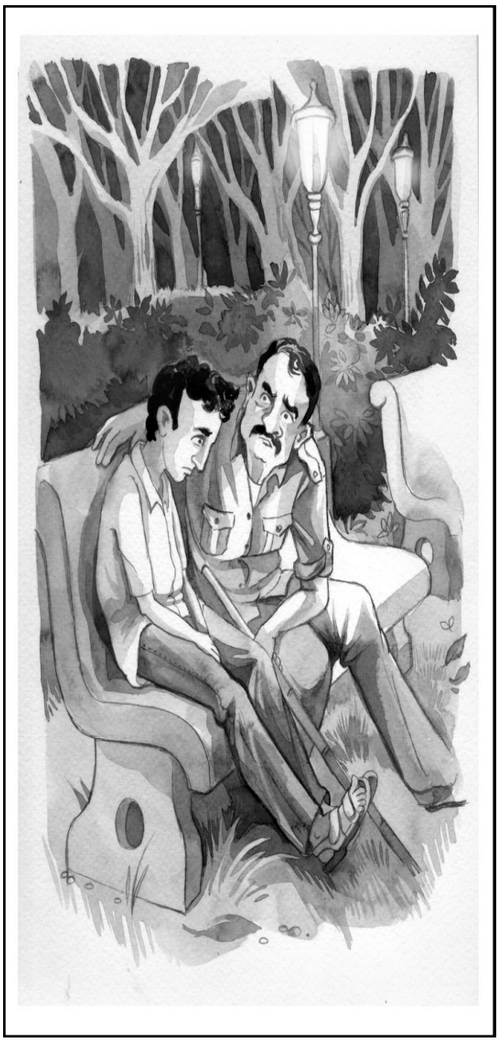

ছবি সৌজন্য—লেখক শ্রী বিকাশ প্রকাশ যোশী

এই পর্যায়ে আমি কিছু প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক গবেষণা শুরু করি। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত লেখিকা লক্ষ্মী গিরি, দীপা বালসাভার, নন্দনা দেব সেন এর লেখা দত্তক কেন্দ্রিক এবং দত্তক সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়তে শুরু করি। এছাড়া ও বিনীতা ভার্গবের লেখা বই ও পড়ি। ইন্টারনেটে উপস্থাপিত দত্তক প্রথা ও তার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন গুলিও পড়ে ফেলি। অরুণ দোহলে এবং অঞ্জলি পাওয়ার যারা তাদের জন্মদাতা মা-বাবাকে অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করেছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলি। যে সমস্ত সিনেমাতে দত্তক এর বিষয়টিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরেছে সেগুলি দেখি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অবস্থানকারী নানান দত্তক বাবা / মা বা দত্তক সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা করি। কলকাতার সংগঠন আত্মজা, ব্যাঙ্গালোরের সুদত্তা দত্তক পরিবার বা এইরকম পুনে, দিল্লী ও মুম্বই এর দত্তক মা-বাবাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের সাথে আলাদা করে কথা বলি।

এছাড়াও পুনের দত্তক প্রদান কারী সংস্থা ভারতীয় সমাজ সেবা কেন্দ্রের রক্সানে কল্যানবালার সঙ্গে দত্তক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন আইনগত ও প্রশাসনিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করি । কয়েকজন সাংবাদিক যারা দত্তক সম্পর্কে লেখালেখি করেন তাঁদের কাছ থেকে বিষয়টির গভীরতা বুঝতে চেয়েছি, বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল ও পুরানের তথ্য পড়ে বুঝতে চেয়েছি। দত্তক প্রক্রিয়ার মনস্তাত্বিক দিকটি বোঝার জন্য শিশু মনস্তত্ববিদ বিশেষত যারা দত্তক সন্তান ও পিতামাতাকে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সাথেই আমার এই গবেষণার কাজে কথা বলেছি এবং তাঁদের যুক্ত করেছি যাতে গবেষণাটি শ্রেণী নিরপেক্ষ হয়। আর এই সব প্রক্রিয়াই আমাকে আমার এই বই এর জন্য অতি মূল্যবান সম্পদ আহরণ করতে সাহায্য করেছে।

শুরু হোক ছোট্ট থেকেই

আমরা সকলেই জানি নতুন কোনো কিছু শুরু করতে গেলে বা শিখতে গেলে শুরু করা উচিত শৈশবেই আর দত্তক এর ক্ষেত্রে তা যেন আরও ব্যপক ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দত্তক সন্তান যত ছোটোবেলায় জানতে পারছে আর যত সহজভাবে তার কাছে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে তত সহজ ভাবেই সে এই সত্য গ্রহণ করতে পেরেছে। বাবা মায়ের কর্তব্য শিশুবেলায় তাদের কাছে এই সত্য তুলে ধরা, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কারুর মুখ থেকে শোনার ধাক্কা তাকে না পেতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বাবা মা এই সত্য জানাতে যত দেরী করবেন ততই তাদের উপর মানসিক চাপ বাড়বে। পুনের মনস্তত্ববিদ ডঃ সান্যগীতা নাদকার্নি’ র মতে, সে যে দত্তক সন্তান এই বিষয়টি তাকে জানানো যেন আলাদা কোনো বড় ঘটনা হিসাবে না জানানো হয়। ছোটবেলা থেকেই নানান ভাবে তার কাছে এই সত্যের সহজ এবং স্বাভাবিক উপস্থাপনা দরকার। তাঁর মতে যেখানে বাবা মা দেরী করেছেন , অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আর বলে উঠতে পারেননি অথবা বললেও সেটা দত্তক সন্তানের উপরে একটা মানসিক চাপই তৈরী করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি জটিল ও হয়েছে।

সে দত্তক সন্তান এটা কখনোই তার পরিচয় নয়

আমার ধারণা ছিল সে যে দত্তক সন্তান এটা তার জীবনের একটা বড় উপলব্ধি এবং হয়ত তার অস্তিত্বের বড় পরিচয়। কিন্তু অনেক দত্তক সন্তানের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি যে এই সত্য তার পরিচয়ের অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিতকর এক অংশ এবং এটা নিয়ে তারা একেবারেই ভাবিত নয় । তারা তাদের অন্য সন্তানদের থেকে কিছুমাত্র আলাদা ভাবেনা (বিশেষত যেখানে দত্তক গ্রহণকে বাবা মা একটি অতি সাধারণ সহজ স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে তাদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন।) কেতকী ওভালের কথায়, যিনি একজন গৃহবধু এবং দুই সন্তানের মা, যাকে তার বাবা-মা ছয়মাস বয়সে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন, "আমি আগেও খুব বিস্মিত হতাম এবং এখন ও অবাক হই যখন দেখি কিছু মানুষ আমাকে দত্তক সন্তানের দৃষ্টিতে দেখেন। এমনকি আমার স্কুলেও কিছু মানুষ অনেক সময় করুণার চোখে আমায় বলেছেন ওহ তুমি দত্তক সন্তান! "আমি কোনোদিন বুঝতেই পারিনি কেন তারা আমার প্রতি করুণা দেখাতে চায়। আমি দত্তক সন্তান এ তো আমার পরিচয় নয়। আমার মূল্য বোধ, আমার পছন্দ, আমার ব্যক্তিত্ব , আমার বন্ধুবান্ধব, আমার শিক্ষা , আমার জীবনই আমার পরিচয় বহন করে ।"

দত্তক গ্রহণ মানে শিশুটির প্রতি কোনো অনুগ্রহ নয়

অনেকেই মনে করেন দত্তক গ্রহণ এক মহান কাজ। অথবা এও মনে করা হয় তারা শিশুটিকে একটি সুন্দর জীবন দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু বহু দত্তক গ্রহণকারী পিতামাতার সঙ্গে কথা বলে আমি দেখেছি যে তারা দত্তক গ্রহণকে কেবল মাত্র সন্তান লাভের আরেকটি পথ বলেই মনে করেন। এই কাজকে তারা কোনও রকম মহান কোনো কাজ বলে মনে করেননা। সুদত্তা পরিবারের টি ভি এস শেখর এর কথায় – "অনেকেই আমাদের বলেন আমরা কত মহান কাজ করেছি কিন্তু আমি এবং আমার স্ত্রী মনে করি আমরা আমাদের সন্তান চেয়েছিলাম আর দত্তক ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোনো পথ খোলা ছিলনা। এর থেকে বেশী কিছুই নয়"।

সাদৃশ্য কি শুধুই চেহারায় ?

লেখক হিসাবে দত্তক সন্তান ও তার বাবা মা এর চেহারার অমিল এর মত উদ্ভট বিষয় আমাকে ভাবিয়েছে। ব্যাক্তিগত জীবনে আমাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে যে আমি বোধহয় দত্তক সন্তান। কারণ আমি আমার বাবা-মা এর থেকে বেশ লম্বা এবং একেবারে অন্যরকম দেখতে । ক্রমে আমি বুঝতে পারি যে দত্তক সন্তান এর চেহারা অন্য রকম হলে ও সকলের মত তারা ক্রমে তার বাবা-মা'র আচরণ , কথা বলার ভঙ্গী , ব্যবহার অনুসরণ করে। আর এই ভাবেই তাদের মুখাবয়ব আলাদা হলেও তারা ক্রমে তাদের বাবা , মা এর মতই "দেখতে" হয়ে যায়। মনে রাখা দরকার জৈবিক সন্তান ও অনেক ক্ষেত্রেই বাবা মা এর থেকে একদম অন্যরকম দেখতে হয়। আর এই বিষয়টি যদি আদৌ কোনো ভাববার বিষয় হয় তাও কেবল মাত্র ছোটোবেলার জন্য যখন অবধি তার পৃথক নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়নি। যখন কোনো শিশু বড় হয় তার নিজস্ব স্বত্বা গড়ে ওঠে তখন এ সমস্ত প্রসঙ্গই অবান্তর এবং গুরুত্বহীন হয়ে যায়। আত্মজা , কলকাতার সদস্য স্বপন নস্কর এবং শুভা মুখোপাধ্যায়ের কন্যা অহিতির কথায় "যখন কেউ আমায় প্রশ্ন করে তুমি কার মত দেখতে বাবা না মা ? আমি বলি আমি আমারই মত" ।

দত্তক প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান পেশাদারিত্ব

আমাদের পুরানের বহু আখ্যানের মধ্যে দিয়ে আমরা দত্তক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কৃষ্ণ , শকুন্তলা, কর্ণের গল্প আমাদের সবার জানা। ভারতবর্ষে দত্তক প্রক্রিয়া প্রথাগত ভাবে সীমিত ছিল দূর আত্মীয়ের মধ্যে। ক্রমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দত্তক প্রদানকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্ব পায়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে যখন ২০১৭ সালে CARA নতুন নিয়মাবলী প্রকাশ করে। এর ফলে একদিকে যেমন ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্ত থেকে দত্তক গ্রহণ করা সহজতর হয় তেমনি আবার দত্তক প্রদানকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

ভারতীয় সমাজ সেবা কেন্দ্রের এগজিকিউটিভ ডাইরেক্টার রক্সানে কল্যানবালার মতে "নতুন এবং পুরানো দুই পদ্ধতিরই সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই আছে। নতুন নিয়মে পদ্ধতিটি অনেক মসৃন ও স্বচ্ছ হয়েছে, এবং দত্তক নিতে আগ্রহী দম্পতি ভারতের যে কোনো প্রান্ত থেকেই সন্তান পেতে পারেন। ওড়িশাতে বসবাসকারী ব্যক্তি মহারাষ্ট্র অথবা অন্য যে কোন রাজ্য থেকেই তাঁদের সন্তান পেতে পারেন । আবার অন্যদিকে আগের পদ্ধতিতে ছিল অনেক বেশি মানবিক ছোঁয়া। দত্তক প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে পরিবার গুলির একটা মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠত, যা এই বর্তমান কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সন্তানের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া মানে কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়

স্বাভাবিক ভাবেই দত্তক সন্তানের মনে জীবনের কোনো এক সময়ে তার জন্মদাতা পিতা মাতা কারা আর কীভাবেই বা তারা এখানে এল ? এই প্রশ্ন আসবেই । বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কৈশোরে প্রবেশের সময় অথবা বয়ঃসন্ধি কালে তাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে। আর এই বয়ঃসন্ধি কাল যে কোনো মানুষের জীবনেই কিছু দ্বন্দ্ব নিয়ে আসে। বেড়ে ওঠার এই পর্যায়ে সে পা রাখে জীবনের এক সন্ধিক্ষণে ,মা বাবার পরিচয়ের বাইরে তার নিজস্ব পরিচিতি তৈরী হতে শুরু করে।

"আমি কেন দত্তক সন্তান? " তাহলে কী আমার মধ্যে কোনো খামতি ছিল?" "আমার জন্মদাতা মা ,বাবা কী আমার কথা ভাবে? " এই সমস্ত প্রশ্ন তার কিশোর মনে ঘুরপাক খায়। সেই সময় এইসব প্রশ্নের উত্তর ও বাবা মাকে খুব সাবধানে, সহানুভূতির সঙ্গে দিতে হয়। বাবা মাকে বুঝতে হবে এইসব প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং এইসব প্রশ্ন করা মানে এই নয় যে তাদের সন্তানের তাঁদের প্রতি ভালবাসা কমে গেছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে দত্তক মা নিলুফার ওয়াদিয়ার সাবধান বাণী ও উল্লেখযোগ্য। তার মতে মা বাবারা যেন এইসময় সন্তানদের অহেতুক অতিরিক্ত প্রশয় না দেন। সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া ছেলেমেয়েরা এইসময় তাদের মন মতো জিনিস না পেলে রাগারাগি, অশান্তি করে থাকে। এই সময় তারা বলতে পারে যেহেতু তারা দত্তক সন্তান তাই তাদের বাবা মা তাদের চাহিদা মেটাচ্ছেন না। এইসময় বাবা মাকে শক্ত হতে হবে এবং কোন মানসিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের সমস্ত অন্যায় আবদার মেনে নিয়ে তাদের ভবিষ্যত যেন নষ্ট করে না দেন ।

কন্যা সন্তানের প্রতি আগ্রহ

সাধারণ ভাবে আমরা জানি যে ভারতবর্ষে কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্য রয়েছে। কিন্তু অন্ততঃ দত্তক সন্তানের ক্ষেত্রে এই ধরণের লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়না। বরং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় কন্যা সন্তান দত্তক নেবার জন্যে মানুষের বেশ আগ্রহ রয়েছে। ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর একটি তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০ সালের মোট দত্তক সন্তানের পঞ্চাশ শতাংশই কন্যা সন্তান।

তুমি একা নও

কথিত আছে যে আমরা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হই আমাদের চারপাশের মানুষের দ্বারা। বহু দত্তক পিতামাতা এবং সন্তানদের সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝেছি যে যখন তাঁদের সন্তান অন্য আরও দত্তক সন্তানদের সঙ্গে পরিচিত হয় তখন তারা বুঝতে পারে তারা একা নয়। অন্য ছেলেমেয়েদের থেকে তারা আলাদা এই ধরণের কোন অস্তিত্বের সংকট থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে। এটা তাদের একটা মানসিক জোর এনে দেয়। তাই দত্তক মা-বাবারা যদি ছোটবেলাতেই তাদের মধ্যে পরচিতি গড়ে তুলতে পারেন তবে ভালো হয়। দত্তক পরিবারগুলির সংগঠন এই ব্যপারে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করতে পারে।

শেষপর্যন্ত যেটা মনে রাখতে হবে

খুব সংক্ষেপে যদি বলা যায় বাবা মা তাদের ছেলেমেয়েকে যে ভালোবাসায় এবং আদরে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আত্মসংযমের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সুন্দর ভাবে গড়ে তুলছেন তার উপরই নির্ভর করছে সন্তানের ভবিষ্যৎ। এভাবেই সন্তানের ভালোভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত হয় এবং তারা আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা এবং ভালোমন্দ কে সঠিক ভাবে মোকাবিলা করতে পারে। তারা নিজেরা যখন সন্তানের পিতামাতা হয় তখন তারাও তাদের সন্তানদের এই ভাবে গড়ে তুলতে পারে।

অবশ্য এটা সব বাবা মায়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । সব বাবা মায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য। দত্তক হোক বা জৈবিক ভাবে জন্মদাতা পিতামাতা সকলের জন্যই তা সত্য। দত্তক কেবল মাত্র সন্তান লাভের একটি উপায় মাত্র, এর বেশী বিশেষ কিছুই নয়। এবং আলাদা কিছুই নয়। দত্তক একটি বাবা মা হবার সহজ স্বাভাবিক আর একটি পদ্ধতি মাত্র।

আমার এই লেখা নিয়ে কারুর কোনো মন্তব্য থাকলে বা আসন্ন বইটি সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে আমাকে ই-মেইল করুন। আমার ই-মেইল আই ডি - **joshi.vikas500@gmail.com**

POSITIVE ADOPTION LANGUAGE

Dr. Jagannath Pati

Positive adoption language could be of great help for the adoptive parents, the adopted children, the service providers, and various stakeholders associated with the profession. By using suitable adoption language, we can educate others about adoption. Here we will understand the meaning of positive adoption language, reasons for using positive language, talking to kids about adoption, etc.

Globally, many thousands of children every year are adopted domestically or through inter- country arrangements, and international policy emphasizes that adoption practices must be guided by the child's best interests (United Nations Convention on the Rights of the Child, article 21). These days, families are being created in more ways than ever—including cutting- edge medical technology as well as domestic and international adoption. After a long struggle with infertility, family-building decisions are taken which could be tough.

Unlike the past, adoption now is more formal. We are in a situation where we have more prospective parents waiting against fewer children available for adoption. It seems more like a rollercoaster that is a ride of twists and turns and not knowing what is around the next turn or hill. Most of us are just not prepared for the abundance of conflicting emotions. It's like getting on a roller coaster you've never ridden before. And there you are, bouncing between happiness, fear, grief, frustration, and joy. They come in and out of your journey unexpectedly and can leave you breathless. In such a situation use of positive language creates a win-win situation.

Meaning

Language can be very powerful. Our choice of words can reveal a lot about who we are and what we think, feel, and value. When we talk about sensitive subjects, therefore, we tend to choose our words more wisely so as not to offend anyone in conversation. We use positive language as a means to show respect to those we are speaking with and to establish a healthy dialogue on even the most delicate topics.1

Recently due to awareness generated by Central Adoption Resource Authority (CARA), the central government, and the states, formal adoption has become more popular in the country. Many prospective adoptive parents are waiting in comparison to available children to be adopted which was not a situation earlier.

It has also got a powerful effect on the way our children feel about their adoption story. Adoption is all about love and we need to share that love and our love for adoption. The language of adoption is changing and evolving. By using adoption language, we need to educate others about adoption. We need to choose emotionally "correct" and "appropriate" words over emotionally-laden words.

By using adoption language, we educate others about adoption. We choose emotionally "correct" words over emotionally-laden words. We speak and write in positive adoption language with the hopes of impacting others so that this language will someday become the norm.2

Language is the vehicle we use daily to communicate our ideas and notions about the world we live in. And although we might not be aware of it, there is also a subtext to the words we choose, reflecting our values in subtle ways, even when we aren't consciously trying to do so. Words have a way of shaping our beliefs and thought processes.

Adoption language has evolved drastically over the decades. The importance of positive adoption language has grown to convey respect for birth parents, adoptees, and adoptive parents. Words are a powerful way of portraying our thoughts. When we use positive adoption language—as someone who made the choice for adoption or as a family member/friend who has been touched by adoption—we are being conscientious of the fact that many people are personally touched by adoption and each of their experiences is unique.3

Whether one is an expectant or birth parent, a waiting adoptive family, clinical professional, or even just a friend to an adoptive family, it is crucial to familiarize with positive adoption language.

Adoption is a sensitive issue, and people who have not experienced it, cannot begin to imagine what it's really like. Adoptive parents want to see their child succeed in every way — emotionally, educationally, mentally, physically, and spiritually. They help them reachgoals, and they often provide them learning opportunities that help enrich them and tap into their natural abilities. Ideally, the adoptive parents should accept the child as he/she is and gradually introduce improvement, if any, in his/her behavior without expecting too much to excel in every sphere of life.

By incorporating positive adoption language into conversations, you can help combat common adoption stereotypes while educating others. The way we talk—and the words we choose—say a lot about what we think and value. When we use positive adoption language, we say that adoption is a way to build a family just as birth is. Both are important, but one is not more important than the other.4

The language of adoption is changing and evolving. Respectful Adoption Language (RAL) is a vocabulary about adoption that has been chosen to reflect maximum respect and dignity for all those who are partners of any adoption process. Language is powerful. It can elicit strong emotions and can influence our thoughts, actions, and beliefs.

Adoptive parents can help children think about and manage their feelings related to adoption through being 'communicatively open' — where parents are comfortable with their feelings about adoption, emotionally attuned to their child's issues as an adopted individual, and empathic towards birth family members.5

Though in adoption, parent and child are linked by love and by law, the fact that they are not connected by blood has often meant that some people are unwilling to acknowledge their relationship as genuine and permanent. In India, the taboo on the term 'adopted child' often creates embarrassment for the child and his or her parents while interacting with relatives, schools, or in peer groups. There is a need to create awareness of the issue.

Some of the examples of use of positive

No	Negative	Positive
1.	Illegitimate	Born to unmarried parents
2.	Adoptive parent	Parent
3.	Reunion	Making contact with
4.	Foreign adoption	International adoption
5.	Handicapped child	Special needs child (In the place of "mentally disabled" children, we may speak/write "intellectually challenged" . Similarly for "physically disabled", we may speak/write " physically challenged")
6.	Real Parents, Real Mom, Real Dad	Biological Parents, Birth Parents, Birth Mom, Birth Dad
7.	Natural Parent	Biological Parent
8.	Own Child	Birth Child
9.	Adopted Child	My Child
10.	You're so lucky your parents adopted you.	You have a beautiful family
11.	Give Up	Terminate Parental Rights
12.	Take Away	Make an Adoption Plan
13	To Keep	To Parent
14	Adoptable Child; Available Child	Waiting Child
15	Birth Father	Biological Father
16	Adoption Triangle	Adoption Triad

(Collected from various sources)

Positive adoption language can lessen the spread of misconceptions like these. By using positive adoption language, we acknowledge the feelings of each party involved in adoption and educate others about this amazing process.

Reasons for using positive language

Whether one communicates verbally, or in written form, the language one uses affects how the message is perceived. Using positive language can help to reduce conflict, improve communication, increase optimism in others, and can portray the speaker/writer as credible and respectable. Words don't just convey facts, they also evoke feelings. In the adoption triad, each one plays a role and each one deserves rightful and dignified language and response.

In India, it has been found that the unwed mother coming to relinquish a baby often faces too many unnecessary questions about her situation from a group of persons who are hardly concerned with her trauma. Instead of positive counseling or supportive step, they raise so many unnecessary queries about her conceiving, etc. which gives a very guilty feeling. An unwed mother deserves dignity; there is no doubt about that. During training conducted at the state level, the members of the Child Welfare Committees (CWCs) are given inputs as to how they have to deal appropriately with the biological mother or the biological parent(s) approaching them for relinquishment of a child. The CWC needs to learn and cultivate the detailed procedure about the consequences of relinquishment in such cases in a manner that does not hurt the biological mother or biological parents. The languages used must be very carefully worded. The biological mother or the parents should be counseled about the effects of surrender of the child and the scope to take back the child within a period of two months in case they decide to do so. The Juvenile Justice Act 2015 and the Model Rules 2016 have stipulated roles for the CWC.

The social worker of the Specialised Adoption Agency or child protection officer engaged with the District Child Protection Unit(DCPU) has to be very careful at different stages, i.e. (a) counselling of biological parents in case of surrender; (b) pre-adoption counselling of prospective adoptive parents during the preparation of Home Study Report, counselling of older children before and during adoption and counselling of adoptive parents whenever required; and post-adoption counselling of the adoptees. The social worker of the SAA at each stage has to be careful about the use of words and semantics while dealing with them. In this regard, Project SAMVAD supported by the Ministry of Women and Child Development and steered by NIMHANS Bangalore is cited to be a national initiative and integrated resource for child protection, mental health and psychosocial care. The focus of the project is to provide support, advocacy and mental health interventions for children in vulnerable circumstances.

All authorized agencies and authorities having a role in the adoption process have got a responsibility to deal with the child, the biological parent(s) and the prospective adoptive parents with appropriate behavior, courtesy, etiquette and politeness.

The words we choose convey a lot about our mode of thinking. Using positive adoption language (PAL) shows respect for birth parents, adoptive parents, and adopted children. When talking about family relationships, it is most common to use: “birth parent,” “birth mother,” or “birth father,” to describe the man and woman who conceived and gave birth to the child. It is also common that the terms “parent,” “mother,” “father,” “mommy,” “daddy,”“child,” “son,” “daughter,” and all common names used when referring to the members of the adoptive family. You need not say “adopted child” or “adoptive parent.” 6

Using positive adoption language in our personal lives helps others become aware of the power that negative adoption language can have, even if it’s not meant in a negative way. Consider how negative language can affect people who were adopted, who have chosen adoption for their children or have adopted as a way to grow their family. Then also consider how positive adoption language would better support their stories and their lives—while also eliminating some of society’s inaccurate impressions about adoption and stopping the spread of misconceptions. Using positive adoption language educates others about adoption so that someday those terms are commonplace.3

Talking with Kids about Adoption

Positive adoption language can help correct the stigma that adoption once carried. It encourages the world to view adoption not as second-best to parenthood, but rather, as a positive option for those who cannot or are not ready to parent. By using positive adoption language, we honour and show respect to birth parents for making a loving, courageous, and selfless choice. For adoptive parents, we affirm their role as their child's forever family. Most importantly, for the child, using honest, but positive language, can be the difference between shame and confidence about their story. It's more than being politically correct. It's being emotionally correct.7

Adoptive parents must determine what and when they will tell their children about their adoption. Many adoption workers advise parents to introduce the word "adoption" as early as possible so that it becomes a comfortable part of a child's vocabulary and to tell a child, between the ages of 2 and 4 that he is adopted. However, some child welfare experts believe that when children are placed for adoption before the age of 2 and are of the same race as the parents, there probably is little to be gained by telling them about their adoption until they are at least 4 or 5 years old. Before that time, they will hear the words but will not understand the concept. 8

Feelings about being adopted influence a child's sense of self-worth and esteem. Adoptive parents are caught in the paradox of helping their child understand what it means to be adopted while knowing that in the process, the child may feel rejected, sad, and hurt. Parents worry about how best to talk about adoption.

A child's curiosity can be a signal for a parent. Answering the question "Where do I come from?" involves discussions about birth, reproduction, and adoption. If your child doesn't ask, you can raise the topic yourself; find out what your child thinks and what he wants to know. It is better to respond to questions than to inundate a child with information. 2

Awareness of the benefits and pitfalls of the language used by adults is important for people who interact with children. The language used by adults affects cognitive growth and learning in children in many subtle ways. Labeling is a powerful way to foster conceptual development. Simple labels can help children unify disparate things into coherent categories, but can also have the unintended consequence of reinforcing categories or concepts that are not desirable.9

It is strongly recommended to share the fact of adoption with the child, and not withhold the same. There will be multiple occasions when the child will get to know about its adoptive status and not sharing the same proactively will only instill a breach of trust with the child. If the child was adopted as an infant, start sharing the adoption story as soon as you start speaking with the child. The child relates to adoption differently, at different stages of life. Their questions on adoption also vary with age. Therefore, the parents have to be utmost comfortable in answering their queries and position adoption as a happy and positive experience before them. Adoption needs to be referred to regularly, per context, as and when the conversation comes up, to comfort the child that its adoption in the family is a welcome and desirable event.

Research has substantiated the fact that parental openness about adoption has been linked to better child emotional and behavioural development and family conversations about adoption are influenced by both parents and children, and the balance as to who initiates and controls family communication moves from parent to child over time.

Development and early learning can be supported continuously as a child develops, and early knowledge and skills inform and influence future learning. When adults understand how the mind develops, what progress children make in their cognitive abilities, and how active

inquiry and learning are children's natural inclination, they can foster cognitive growth by supporting children's active engagement with new experiences and providing developmentally appropriate stimulation of new learning through responsive, secure, and sustained care giving relationships.9

Children's interest in adoption varies throughout the developmental stages of childhood and adolescence. As children progress from one stage to another, they gain new cognitive abilities and psychosocial structures. They look at adoption differently and, often, have more concerns or questions. Their questions may diminish until a new cognitive and psychosocial level is reached. Parents can facilitate this developmental process by being knowledgeable and supportive, and by continuing to retell their child his or her adoption story.10

If the child was adopted at an older age, it is imperative to reassure the child through positive re-enforcements, that adoption has indeed made their lives, of parents and the children, happier and better. The child must learn of her/ his adoption from the adoptive parents and, not from outside. This makes a huge difference in her/ his handling of the grief of separation from the birth parent and, facing the reality of being relinquished.

References

1. **https://adoptionswithlove.org/uncategorized/adoption-language**
2. **https://www.adoptivefamilies.com/talking-about-adoption/positive-adoption- language/**
3. **https://chlss.org/blog/positive-adoption-language-infographic/**
4. **https://www.adoptivefamilies.com**
5. **Brodzinsky(2005), Re-conceptualizing openness in adoption: Implications for theory, research and practice D. Brodzinsky, J. Palacios (Eds.), Psychological issues in adoption: Research and practice, Greenwood, New York , pp. 145-166**
6. **https://www.adopthelp.com/why-positive-adoption-language-matters/**
7. **https://www.adoptmatch.com/words-matter-adoption-terminology/**
8. **https://www.parents.com/parenting/adoption/parenting/positive-adoption-language/**
9. **https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310550/**
10. **https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804559/**

***

Dr Jagannath Pati , Joint Director (Admin, Finance, Policy, & Coordination) of Central Adoption Resource Authority , has 20 years of experience as a leader in the area of policy and governance in the child welfare system in the country (India) . We thankfully acknowledge for this valuable article he has written for Atmakatha which is no doubt a major value addition to our magazine .. …… (Editors , Atmakatha)

আত্মজা'র বর্তমান কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য বৃন্দ

চেয়ার পারসন — শ্রী স্বপন নস্কর
ভাইস চেয়ার পারসন — শ্রীমতি সীমন্তিকা নাগ
সম্পাদক - শ্রী অনুপ দেওয়ানজি
সহ সম্পাদক - শ্রী প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ - শ্রী সঞ্জয় শিকদার
সহ কোষাধ্যক্ষ—শ্রী শংকর নস্কর

- সদস্য -

শ্রী সুবীর ব্যনার্জি
শ্রী অচিন বসু
শ্রী দীপঙ্কর পাত্র
শ্রীমতি নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত
শ্রীমতি সংঘমিত্রা পাল

- আমন্ত্রিত সদস্য -

শ্রী গৌতম ঘোষ
শ্রী প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

* আত্মকথা ' র সম্পাদক মন্ডলী *

শ্রী প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায় * শ্রী সঞ্জয় শিকদার * শ্রী অনুপ দেওয়ানজি এবং শ্রী স্বপন নস্কর

"স্বপ্ন দেখি সে-পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে-
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি।"

(পথ — প্রেমেন্দ্র মিত্র)

আত্মকথা ' র পক্ষে স্বপন নস্কর কর্তৃক ৫১৭ যোধপুর পার্ক , কলকাতা—৭০০০৬৮ থেকে প্রকাশিত।

পত্রিকার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

atmaja | an association of adoptive parents
Registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961
Registration No. - S/1V/1844 of 2000-2001.